

ফাতওয়াপ্রার্থীর আদব-নির্দেশিকা



মুফতি আবু মুহাম্মাদ আবদুল্লাহ আল মাহদী (হাফিয়াহুল্লাহ)

ফাতওয়াপ্রার্থীর আদব-নির্দেশিকা

মুফতি আবু মুহাম্মাদ আবদুল্লাহ আল মাহদী (হাফিযাহুল্লাহ)



সূচিপত্র

ইস্তেফতার বিধান	৫
ইস্তেফতার আদব ও নীতিমালা.....	৫
নির্ভরযোগ্য আলেম নির্বাচিত করা	৫
প্রয়োজনে সফর করা	৭
একটি দুঃখজনক বাস্তবতা	৮
নির্ভরযোগ্য আলেম কিভাবে চিনব?	৯
সংশ্লিষ্ট বিষয়ে বিজ্ঞ হওয়া	১০
তাকওয়ার অধিকারী হওয়া	১১
সর্বাধিক বড় আলেম হওয়া জরুরি নয়.....	১২
বাহ্যিক খ্যাতি যথেষ্ট নয়	১২
ইন্টারনেটে ইস্তেফতা	১৪
অপ্রয়োজনীয় প্রশ্ন না করা.....	১৫
জ্ঞানের উর্ধ্বে জটিল বিষয়ে প্রশ্ন না করা	১৭
প্রশ্নে শুধু জরুরি তথ্য দেয়া.....	১৯
ইখলাস ও সত্য গ্রহণের মানসিকতা	২১
আলেমের আদব বজায় রাখা	২৭
মানার জন্য দলিল তলব না করা.....	২৯
মুফতি সাহেব যদি ভুল ফাতওয়া দেন!.....	৩১
“...আলেমদের মাঝে মতভেদ হলে আম মানুষ কী করবে?	৩৩
অবশ্য অন্য কারণে দলিল চাইতে পারবে.....	৩৫
উত্তর পাওয়ার পর অন্যজনকে প্রশ্ন না করা	৩৭
উত্তরে যৌক্তিক সংশয় হলে করণীয়	৩৮
দু’জন দু’রকম উত্তর দিলে করণীয়.....	৩৯
অস্বাভাবিক অবস্থায় প্রশ্ন না করা	৪০
উত্তরের জন্য তাড়াহুড়া না করা	৪০

ফাতওয়াপ্রার্থীর আদব-নির্দেশিকা

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى من تبعه. وبعد.

প্রথমে সংক্ষেপে সংশ্লিষ্ট কয়েকটি পরিভাষা উল্লেখ করছি, যে পরিভাষাগুলো উক্ত লেখায় ব্যবহৃত হবে।

ইস্তেফতা: ইস্তেফতা অর্থ ফাতওয়া জানতে চাওয়া, মাসআলা জানতে চাওয়া বা কোনো বিষয়ে শরীয়তের সমাধান জানতে চাওয়া। আরও সহজে বলতে পারি, দ্বীন বিষয়ক যে কোনো প্রশ্ন করা; তা লিখিত হোক বা মৌখিক।

ফাতওয়া: দ্বিনি যে কোনো প্রশ্নের উত্তর।

মুস্তাফতি: যিনি ফাতওয়া বা মাসআলা জানতে চান বা দ্বীন বিষয়ক কোনো প্রশ্ন করেন।

মুফতি: যিনি ফাতওয়া প্রদানে বিজ্ঞ। সুতরাং যিনি কখনোসখনো দু’একটি প্রশ্নের উত্তর দেন, তিনি মুফতি নন। একইভাবে যিনি শুধু ইফতা কোর্স সম্পন্ন করেছেন, কিন্তু ফাতওয়া প্রদানে বিজ্ঞ না, তিনিও মুফতি নন। তবে যিনি বর্তমানের প্রচলিত ইফতা কোর্স করেননি, কিন্তু বিজ্ঞ কোনো মুফতির তত্ত্বাবধানে পর্যাপ্ত পড়াশোনা ও অনুশীলন করে ফাতওয়া প্রদানে বিজ্ঞ হয়েছেন তিনি মুফতি হবেন। তাঁকে মুফতি বলা হবে।

‘মুফতি’ শব্দের এ অর্থটি বললাম বর্তমান প্রচলন হিসেবে। অন্যথায় সালাফের যামানায় প্রকৃত মুফতি তাঁকেই বলা হত, যিনি শরীয়তের যে কোনো বিষয়ের সমাধান সরাসরি কোরআন সুন্নাহ থেকে ইজতিহাদ করে বের করতে সক্ষম। অর্থাৎ যিনি মুজতাহিদ, তিনিই মুফতি।

ইস্তেফতার বিধান

যে কোনো স্তরের একজন মুসলিমের উপর শরীয়তের যে বিধান যখন আরোপিত হয়, তা আমল করার পূর্বে সে বিষয়ক ইলম অর্জন করা তার উপর ফরজ। একজন ব্যক্তির উপর যখন যাকাত ফরজ হয়, যাকাত প্রদানের আগেই যাকাত আদায়ের প্রয়োজনীয় মাসায়েল জেনে নেয়াও তার উপর ফরজ হয়।

কিন্তু যিনি নিজে কোরআন সুন্নাহ ও ইসলামী শরীয়াহ'র নির্ভরযোগ্য কিতাব থেকে সরাসরি সেই ইলম অর্জনে সক্ষম নন, তার উপর নির্ভরযোগ্য আলেমকে জিজ্ঞেস করে তা জেনে নেয়া ফরজ। কোরআনে কারীমে ইরশাদ হচ্ছে,

فَاسْأَلُوا أَهْلَ الدِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

“তোমরা যদি না জান, তবে ইলমের অধিকারী লোকদের জিজ্ঞেস কর”। সূরা নাহল (১৬) : ৪৩; সূরা আন্নিয়া (২১) : ০৭

ইস্তেফতার আদব ও নীতিমালা

কোনো বিষয়ের ইলম অর্জনের জন্য কোনো আলেমের কাছে ইস্তেফতা করা বা জানতে চাওয়ার কিছু আদব ও নীতিমালা রয়েছে। আমরা এখানে সংক্ষেপে এমনই কিছু নীতিমালা সম্পর্কে আলোচনা করব ইনশাআল্লাহ।

নির্ভরযোগ্য আলেম নির্বাচিত করা

কারো কাছে কোনো ফাতওয়া জিজ্ঞেস করার আগে ফাতওয়া জানতে আগ্রহী ব্যক্তির প্রথম দায়িত্ব হল, ফাতওয়া জিজ্ঞেস করার জন্য একজন নির্ভরযোগ্য আলেম নির্বাচন করা। শরীয়তের দৃষ্টিতে কোনো আলেম নির্ভরযোগ্য কি না, তা যাচাই না করেই তার কাছে কোনো ফাতওয়া জানতে চাওয়া, তার থেকে কোনো ফাতওয়া গ্রহণ করা এবং সেই ফাতওয়া অনুযায়ী আমল করা, সবই নাজায়েয ও গোমরাহির কারণ। এটি কেয়ামত নিকটবর্তী হওয়ারও একটি নিদর্শন। হাদীসে এসেছে,

اتَّخَذَ النَّاسُ رُؤُوسًا جَهْلًا، فَسُئِلُوا فَأَفْتَوْا بِغَيْرِ عِلْمٍ. فَضَلُّوا وَأَضَلُّوا. -صحيح

البخاري، دار الفكر، ج: 1، ص: 35

“(কেয়ামতের পূর্বে) মানুষ অজ্ঞ লোকদের অনুসৃত বানাবে। তাদেরকে প্রশ্ন করা হবে। তারা না জেনে উত্তর দেবে। এভাবে নিজে গোমরাহ হবে এবং অন্যকেও গোমরাহ করবে।” —সহীহ বুখারী: ১০০; সহীহ মুসলিম: ২৬৭৩

আল্লামা তাকি উসমানি হাফিয়াহুল্লাহ বলেন,

يجب على المستفتي ألا يسأل إلا من عرف علمه، وعدالته، وكونه أهلاً للإفتاء، سواء علم ذلك بنفسه، أو بإخبار ثقة عارف، أو باستفاضة، بأن علماء ذلك الوقت يثقون بفتواه. ويجب عليه قبل الاستفتاء أن يبحث عنه بالقدر المستطاع. -اصول الإفتاء: 330-331

“মুস্তাফতির কর্তব্য, এমন ব্যক্তি ব্যতীত অন্য কাউকে ইস্তেফতা না করা, যার ইলম ও সততা এবং ফাতওয়া প্রদানের যোগ্য হওয়ার বিষয়টি তার জানা আছে। চাই তা সে নিজে জানুক বা নির্ভরযোগ্য কোনো বিজ্ঞ ব্যক্তির জানানোর মাধ্যমে জানুক, অথবা এমন সুখ্যাতির কারণে জানুক যে, সমকালীন উলামায়ে কেরাম তাঁর ফাতওয়ার উপর আস্থা রাখেন। ইস্তেফতা করার পূর্বে সাধ্যানুযায়ী এমন ব্যক্তির অনুসন্ধান করা তার কর্তব্য।” —উসুলুল ইফতা: ৩৩০-৩৩১

সুতরাং, কেউ যদি যাচাই-বাছাই ছাড়াই অনির্ভরযোগ্য কোনো আলেমের কাছে কোনো ফাতওয়া জানতে চায় এবং তিনি ভুল ফাতওয়া দেন তাহলে এর গুনাহ মুস্তাফতি ও মুফতি উভয়ের উপরই আসবে।

পক্ষান্তরে, কেউ যদি যথাযথ নিয়ম রক্ষা করে নির্ভরযোগ্য আলেম নির্বাচন করার পর তাকে ইস্তেফতা করেন, কিন্তু তিনি ঘটনাক্রমে ভুল ফাতওয়া দেন (বলা বাহুল্য, নির্ভরযোগ্য আলেমের ফাতওয়া সাধারণত ভুল হবে না, হলেও তা ঘটনাক্রমেই হবে), তাহলে মুস্তাফতির কোনো গুনাহ হবে না এবং আলেম যদি তাঁর সাধ্যানুযায়ী চেষ্টা করার পর এমন ভুল হয়ে যায়, তবে তিনিও গুনাহগার হবেন না। অবশ্য ভুল প্রকাশিত হয়ে গেলে, উভয়কেই ভুল থেকে

ফিরে আসতে হবে। এ প্রসঙ্গে খতীব বাগদাদি রহ. (৪৬৩ হি.) একটি ঘটনা বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন,

أن الحسن بن زياد، وهو اللؤلؤي استفتي في مسألة فأخطأ، فلم يعرف الذي أفتاه، فاكترى مناديا ينادي: أن الحسن بن زياد استفتي يوم كذا وكذا في مسألة فأخطأ فمن كان أفتاه الحسن بن زياد بشيء فليرجع إليه، فمكث أياما لا يفتي، حتى وجد صاحب الفتوى، فأعلمه أنه قد أخطأ، وأن الصواب كذا وكذا. -الفقيه والمتفقه، رقم:

1205

“হাসান ইবনে যিয়াদ লু'লুই রহ.কে এক মাসআলায় ইস্তেফতা করা হয়েছিল। তিনি উত্তরে ভুল করেছিলেন। কিন্তু যাকে ফাতওয়া দিয়েছিলেন, তাকে চিনতেন না। ফলে তিনি একজন ঘোষক ভাড়া করলেন। তিনি ঘোষণা দিতে থাকলেন, হাসান ইবনে যিয়াদকে অমুক দিন, অমুক মাসআলায় ইস্তেফতা করা হয়েছিল। তিনি তার উত্তরে ভুল করেছিলেন। সুতরাং হাসান ইবনে যিয়াদ এ বিষয়ে যাকে ফাতওয়া দিয়েছেন, তিনি যেন তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করেন!

এ অবস্থায় কিছুদিন তিনি ফাতওয়া প্রদান থেকেও বিরত থাকলেন। অবশেষে যখন সেই ফাতওয়াপ্রার্থীকে পেলেন, তাকে জানিয়ে দিলেন যে, ফাতওয়াটি ভুল ছিল, সঠিক ফাতওয়া এই।” -আল ফকীহ ওয়া/ল মুতাফাঈহ: ১২০৫

প্রয়োজনে সফর করা

নিজ এলাকায় নির্ভরযোগ্য আলেম না পেলে, প্রয়োজনে যেখানে নির্ভরযোগ্য আলেম পাওয়া যাবে, সেখানে সফর করতে হবে। মনে রাখতে হবে, একটি ভুল মাসআলা কখনো কখনো আমার দীন-দুনিয়া সবই বরবাদ করে দিতে পারে। এজন্য আমি যে মাসআলাটি জানব, সেটি যাতে সঠিক হয়, তার জন্য আমার সাধের সবটুকু শ্রম ও অর্থ ব্যয় করে হলেও সর্বাত্মক চেষ্টা করতে হবে। দ্বীনের ইলম এতই অমূল্য রত্ন, যার একটি অংশের জন্য সমগ্র দুনিয়ার সম্পদ ব্যয় করলেও তা নিতান্তই কম। এর জন্য আমি যা-ই ব্যয় করব,

সব কিছুর সওয়াব অনেক গুণ বাড়িয়ে আল্লাহ তাআলা আমার আমলনামায় লিখে দেবেন ইনশাআল্লাহ। মুসলিম মনীষীগণ নিজেরা অনেক বড় আলেম হওয়া সত্ত্বেও ছোট ছোট এক একটি মাসআলার জন্য, এক একটি হাদীসের শুধু নির্ভরযোগ্যতা যাচাইয়ের জন্য দেশের পর দেশ সফর করেছেন।

সুতরাং আমাকেও ইলমের এই ফরজ আদায়ের জন্য নির্ভরযোগ্য আলেমের সন্ধানে যেখানে প্রয়োজন, সেখানেই যেতে হবে। যা প্রয়োজন তাই করতে হবে।

একটি দুঃজনক বাস্তবতা

কিন্তু অত্যন্ত দুঃজনক বাস্তবতা হল, আজ আমাদের কাছে দীন-ধর্ম ও পরকালের বিষয়গুলো এতই মূল্যহীন হয়ে পড়েছে যে, শরীয়তের অনেক গুরুত্বপূর্ণ মাসআলা জানার জন্যেও কাকে জিঙ্গেস করব, তা যাচাই করার ন্যূনতম প্রয়োজনীয়তাও আমরা বোধ করি না। সামান্য একটা বাড়ি নির্মাণ করতে হলে ভালো একজন ইঞ্জিনিয়ারের জন্য কত দৌড়ঝাঁপ দেই, নিজের কোনো রোগী দেখানোর জন্য কত ডাক্তার এবং কত হাসপাতালের খোঁজ খবর নিই? আর যখন দ্বীনের কোনো মাসআলার প্রয়োজন পড়ে, তখন হয় নিজে যতটুকু জানি ততটুকুই যথেষ্ট মনে করি। কিংবা কাউকে জিঙ্গেস করার প্রয়োজন মনে করলে টুপি-পাঞ্জাবি পরিহিত কাউকে দেখলেই প্রশ্ন করে বসি। একটুও চিন্তা করি না, আদৌ লোকটি শিক্ষিত কি না? তারপর না হয় আসবে ফাতওয়া বিশেষজ্ঞ হওয়ার প্রশ্ন!

ছোট একটি ঘটনা শুনলে, আমাদের সমাজের চিত্রটা কত করুণ, তা বুঝতে সহজ হবে। আমার এক মুসল্লি ভাই। ভূমি অফিসের কর্মকর্তা। সমাজে মোটামুটি নামাযি ও ধার্মিক মানুষ হিসেবেই পরিচিত। তিনি একদিন আমাকে বলছেন, হুজুর! আমার একটা কঠিন মাসআলা জানার ছিল। মুয়াজ্জিন সাহেবকে জিঙ্গেস করলাম, তিনি উত্তর দিতে পারলেন না। ভাবলাম বড় মসজিদের মুয়াজ্জিন সাহেব অনেক পুরোনো অভিজ্ঞ মুয়াজ্জিন! তাই তাকে জিঙ্গেস করলাম, কিন্তু তিনিও পারলেন না। তারা দুইজনই বললেন, একমাত্র আপনিই এর উত্তর দিতে পারবেন।

চিন্তা করে দেখুন, সমাজের স্বীকৃত শিক্ষিত একজন ধার্মিক মানুষের ধর্মীয় জ্ঞানের যদি এমন দশা হয়, তাহলে সেই সমাজের সাধারণ মানুষের অবস্থা কত করুণ? যেখানে ১২/১৪ বছর পড়াশোনা করে সাধারণ আলেমরা পর্যন্ত অতি সাধারণ বিষয়গুলোর বাইরে একটু গুরুতর বিষয়ের মাসআলা বলার হিম্মত করেন না, সেখানে তিনি জটিল মাসআলার সমাধানের জন্য মুয়াজ্জিনদের দ্বারে দ্বারে ঘুরছেন। অথচ আমাদের সমাজে মুয়াজ্জিন হওয়ার জন্য অধিকাংশ ক্ষেত্রেই কে.জি.-প্লে স্তরের কিংবা এক বছর মেয়াদি নূরানী প্রশিক্ষণের বেশি ধর্মীয় জ্ঞান থাকার প্রয়োজন মনে করা হয় না!

নির্ভরযোগ্য আলেম কিভাবে চিনব?

একজন সাধারণ মুমিনের জন্য এটি খুবই জটিল ও গুরুতর একটি প্রশ্ন। তবে প্রশ্নটি যত জটিল ও গুরুতর, তার চেয়ে এর উত্তরটি অনেক বেশি সাধারণ ও সহজতর। আপনি নিজে ইঞ্জিনিয়ার না হয়েও ইঞ্জিনিয়ারের প্রয়োজন হলে যেভাবে একজন ভালো ইঞ্জিনিয়ার খুঁজে বের করে নেন, নিজে মিস্ত্রি না হয়েও প্রয়োজন হলে যেভাবে ভালো মিস্ত্রি খুঁজে বের করে ফেলেন, নিজে ডাক্তার না হয়েও প্রয়োজনে যেভাবে বিজ্ঞ ও সেরা ডাক্তার খুঁজে বের করে ফেলেন, ঠিক সেভাবেই আলেম না হয়েও আপনাকে ভালো ও নির্ভরযোগ্য আলেম অবশ্যই বের করে নিতে হবে। শুধু আপনার এই বিশ্বাসটা প্রয়োজন যে, ডাক্তার কিংবা ইঞ্জিনিয়ার নির্ভরযোগ্য না হলে, আমি যতটা ক্ষতিগ্রস্ত হব, তার চেয়ে হাজার, লক্ষ, কোটি গুণ বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হব, যদি আমি দ্বীনি বিষয়ে যার উপর নির্ভর করব, তিনি নির্ভরযোগ্য না হন। ইঞ্জিনিয়ার নির্ভরযোগ্য না হলে হয়তো আমার দশ বিশ লাখ কিংবা কোটি টাকার ক্ষতি হবে। ডাক্তার নির্ভরযোগ্য না হলে হয়তো কিছুদিন রোগে শোকে কষ্ট করতে হবে বা সর্বোচ্চ মৃত্যুবরণ করতে হবে। কিন্তু আমার দ্বীনি বিষয়ের ফাতওয়া নির্ভরযোগ্য না হলে, আল্লাহ না করুন, হয়তো ঈমান হারিয়ে এমন কঠিন আগুনে নিক্ষিপ্ত হতে হবে, যেখান থেকে হাজার লক্ষ কোটি টাকার সম্পদ; এমনকি আপন সন্তানকে মুক্তিপণ দিলেও আর কোনো দিনই নিষ্কৃতি পাওয়া যাবে না। ইরশাদ হচ্ছে,

وَلَا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا (10) يُبْصِرُونَهُمْ يَوْمَذِ الْمُحْرَمِ لَوْ يَفْتَدِي مِنْ غَدَابِ يَوْمَئِذٍ
بَيْنِيهِ (11) وَصَاحِبِيهِ وَأَخِيهِ (12) وَفَصِيلَتِهِ الَّتِي تُؤْوِيهِ (13) وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا
ثُمَّ يُنْجِيهِ (14) كَلَّا إِنَّهَا لَأَطَى (15) نَزَّاعَةً لِلشَّوَى (16)، -المعارج

“সেদিন অন্তরঙ্গ বন্ধু অন্তরঙ্গ বন্ধুর খোঁজ নিবে না। তাদের একজনকে অন্যজনের দৃষ্টিগোচর করা হবে। সেদিন অপরাধীরা চাইবে, যদি সে ওই দিনের আযাব থেকে বাঁচার জন্য মুক্তিপণ দিতে পারত আপন সন্তান সন্ততি, স্ত্রী ও ভাইকে। আপন জ্ঞাতি-গোষ্ঠীকে, যারা তাকে আশ্রয় দিত এবং পৃথিবীর বুকে যা আছে সবকিছুকে, যাতে এই মুক্তিপণ তাকে মুক্ত করে। না, তা কস্মিনকালেও হবার নয়! এ তো সেই লেলিহান অগ্নি, যা চামড়া খসিয়ে ফেলবে!” -সূরা মাআরিজ (৭০): ১০-১৬

ফার্সি ভাষার একটি প্রবাদ আছে,

نیم طیب خطره حبان است، نیم ملا خطره ایمان است

‘হাতুড়ে ডাক্তারে জানের ঝুঁকি, হাতুড়ে মোল্লায় ঈমানের ঝুঁকি।’

বস্তুত দীন ও ঈমান, ইলম ও আমল এবং আখেরাতের বিষয়গুলো আমাদের কাছে গুরুত্বহীন হওয়ার কারণেই আমরা নির্ভরযোগ্য আলেম খুঁজে পাই না কিংবা পাওয়া জটিল মনে করি। অন্যথায় সদিচ্ছা থাকলে এটি খুবই সহজ একটি বিষয়। একজন মুসলিমের উপর শরীয়ত যতটুকু ইলম অর্জন করা ফরজ করেছে, ততটুকু ইলম যদি একজন অর্জন করে এবং সত্যিকার অর্থেই দিল থেকে একজন হক্কানি ও নির্ভরযোগ্য আলেম খুঁজে পেতে চায়, তাহলে অবশ্যই আল্লাহ তাকে এমন নির্ভরযোগ্য আলেমের সন্ধান দিয়ে দিবেন, এতে কোনো সন্দেহ নেই। তথাপিও আমরা এখানে অতি সংক্ষেপে নির্ভরযোগ্য আলেমের গুরুত্বপূর্ণ মৌলিক দু’টি বৈশিষ্ট্য আলোচনা করছি।

সংশ্লিষ্ট বিষয়ে বিজ্ঞ হওয়া

যার কাছে ইস্তেফতা করব, তাঁকে ফিকহ ফাতওয়ায় বিজ্ঞ হতে হবে। একজন মানুষ কোনো বিষয়ে বিজ্ঞ কি না, তা বুঝার জন্য সে বিষয়ে বিজ্ঞ হতে

হয় না। বারবার তার আলোচনা ও কথাবার্তা শুনলে, তার সাহচর্যে সময় কাটালে, আচার আচরণ ও লেনদেন ইত্যাদি সময় নিয়ে পর্যবেক্ষণ করলে; একটা স্তর পর্যন্ত যে কেউই তা উপলব্ধি করতে পারবে ইনশাআল্লাহ।

নির্ভরযোগ্যতা যাচাইয়ের আরেকটি প্রক্রিয়া হল, তার সম্পর্কে সমকালীন হকপন্থী বিজ্ঞ ও বুজুর্গ উলামায়ে কেরামের মতামত নেয়া। আহলে হক উলামায়ে কেরাম যদি কোনো আলেম সম্পর্কে বলেন, তিনি ফিকহ ফাতওয়ায় বিজ্ঞ, তার কাছে ইস্তেফতা করা যায়, তার উপর ইলমী বিষয়ে আস্থা রাখা যায়, তার ভিত্তিতেও আমরা নির্ভরযোগ্য আলেম নির্বাচনে সহায়তা পেতে পারি ইনশাআল্লাহ।

তাকওয়া অধিকারী হওয়া

নির্ভরযোগ্য আলেমের আরেকটি আবশ্যিকীয় বৈশিষ্ট্য হল, তাঁর মাঝে তাকওয়া থাকা। তাকওয়া অনেক ব্যাপক একটি বৈশিষ্ট্য, যাতে সততা ও সত্যবাদিতা, ইনসাফ ও ন্যায়পরায়ণতা, যুহুদ ও দুনিয়াবিমুখতা, আল্লাহর ভয় ও পরকালের ভয় সবই অন্তর্ভুক্ত। একজন আলেমের কাছে ইস্তেফতা করার জন্য যে বিষয়টি বিশেষভাবে লক্ষণীয়, তা হল তার মাঝে এই পরিমাণ তাকওয়া ও আল্লাহর ভয় আছে কি না, যার ফলে তিনি ভুল মাসআলা বলা থেকে বিরত থাকবেন। কখনো দুনিয়ার লোভ কিংবা কোনো অনিষ্টের ভয় তাঁকে ভুল মাসআলা বলতে তাড়িত করবে না। মাসআলার সমাধান জানা না থাকলে নিজের কাল্পনিক ইজ্জত রক্ষার জন্য আমাকে ভুল মাসআলা বলবেন না; বরং নির্দিধায় নিজের অজ্ঞতা স্বীকার করে বলবেন, ‘আমি জানি না’।

মৌলিকভাবে কোনো আলেমের মাঝে উপরোক্ত দুটি বিষয় তথা তাকওয়া ও বিজ্ঞতা থাকলে, তিনি নির্ভরযোগ্য আলেম হিসেবে বিবেচিত হবেন এবং তাঁর কাছে ইস্তেফতা করা যাবে ইনশাআল্লাহ। পক্ষান্তরে উক্ত দুটি গুণের সমন্বয় না থাকলে, তার কাছে মাসআলা জিজ্ঞেস করা নিরাপদ নয়।

সর্বাধিক বড় আলেম হওয়া জরুরি নয়

ইস্তেফতা করার জন্য উপরোক্ত বৈশিষ্ট্যের আলোকে নির্ভরযোগ্য একজন আলেম হলেই যথেষ্ট। আমার নাগালে যদি এমন নির্ভরযোগ্য একাধিক আলেম থাকেন, তাহলে তাঁদের মধ্যে যিনি সর্বাধিক বড়, তাঁর থেকে জানা জরুরি নয়। বরং আমার দিল যাঁর প্রতি আগ্রহী হয়, কিংবা যাকে জিজ্ঞেস করা আমার জন্য সহজ হয়, এমন যেকোনো একজন থেকেই মাসআলা জেনে নিতে পারি। অবশ্য একই মজলিসে বড় আলেম থাকলে, তাঁকে জিজ্ঞেস করাই আদব ও শিষ্টাচারের দাবি।

আল্লামা তাকি উসমানি হাফিয়াহুল্লাহ বলেন,

يجوز الاستفتاء من عالم أهل لذلك، سواء وجد في البلد من أعلم منه، ولا يجب عليه أن يبحث عن أعلم الناس. أصول الإفتاء: 331

“ফাতওয়া প্রদানের যোগ্য যেকোনো আলেমের কাছে ইস্তেফতা করার অবকাশ আছে, চাই সে অঞ্চলে তার চেয়েও বিজ্ঞ কেউ থাকুন না কেন। যিনি সবচেয়ে বিজ্ঞ, তাঁকে সন্ধান করা জরুরি নয়।” -উসুলুল ইফত/ : ৩৩১

বাহ্যিক খ্যাতি যথেষ্ট নয়

বর্তমান সময়ে অনেক সাধারণ মুসলিমকে একটি ব্যাপারে বিভ্রান্তিতে নিপতিত হতে দেখা যায়। তা হল কোনো আলেম যখন কোনো একটি বিশেষ গুণের কারণে ব্যাপক সুখ্যাতি লাভ করেন, তখন সব বিষয়ের সমাধান আমরা তাঁর কাছ থেকে আশা করি এবং মনে করি, সব বিষয়ে তাঁর সমাধান ও নির্দেশনাই সর্বাধিক নির্ভরযোগ্য। যেমন, একজন আলেম লেখক হিসেবে বিখ্যাত। জাতীয় দৈনিকগুলো পর্যন্ত তাঁর লেখা গুরুত্ব দিয়ে প্রকাশ করে। বিশেষ অঙ্গনে তাঁর এই গ্রহণযোগ্যতা ও খ্যাতি দেখে; আমরা অনেকে মনে করি, তিনি সবকিছুতেই নির্ভরযোগ্য। সুতরাং তিনি কোনো ফাতওয়া দিলে সেটা যেমন নির্ভরযোগ্য, তেমনি কোনো হাদীসের উদ্ধৃতি দিলে সেটাও নির্ভরযোগ্য। বস্তুত এমন মনে করা চরম বোকামি ও মুর্থতা!

এমনিভাবে একজন আলেম হয়তো আলেম হিসেবে খুবই সাধারণ স্তরের। খুব গভীর ইলমের অধিকারী নন। কিন্তু তাঁর আমল খুবই উন্নত। আল্লাহর সঙ্গে তার সম্পর্ক অনেক গভীর। মানুষের মাঝেও তিনি সমাদৃত ও বুজুর্গ হিসেবে গ্রহণযোগ্য। এমন মানুষদের স্বীকৃত বুজুর্গি ও গ্রহণযোগ্যতা দেখেও আমরা অনেকে ধোঁকায় পড়ে যাই এবং মনে করি, তিনি যা বলবেন, যা করবেন সবই গ্রহণযোগ্য। এজন্য ফাতওয়া ও মাসআলার জন্যও আমরা তাঁর উপরই নির্ভর করি এবং যিনি বাস্তবে ফাতওয়াশাস্ত্রে নির্ভরযোগ্য, তিনি এই মাপের বুজুর্গ ও সমাদৃত না হওয়ায়; তার মোকাবিলায় এই বুজুর্গের ফাতওয়াকে অগ্রাধিকার দিই। এটাও বোকামি ও নির্বুদ্ধিতা।

আরও বেশি বিভ্রান্তি ঘটে ওয়াজের অঙ্গনে। একজন আলেমকে হয়তো আল্লাহ ওয়াজ করার ভালো যোগ্যতা দিয়েছেন। তার ওয়াজে প্রচুর শ্রোতা সমাগম হয়, যা সাধারণত অন্য আলেমদের ওয়াজে হয় না। তখন আমরা তাকে ফিকহ-ফাতওয়া, হাদীস, তাফসীর সব বিষয়ে সবার সেরা মনে করতে থাকি এবং এই সকল বিষয়ে তার কথাকেই অগ্রাধিকার দিতে থাকি। এমনকি তিনি যদি সুস্পষ্ট মওজু (জাল) হাদীসও বলেন, ঈমান পরিপন্থী কোনো মাসআলাও বলেন, তাও আমরা লুফে নিই।

এমন কর্ম নিতান্তই তুল এবং চরম স্তরের অঙ্গতা। আমাদের মনে রাখতে হবে, ভাল লেখক হওয়া, ভাল বুজুর্গ হওয়া এবং ভাল ওয়ায়েজ হওয়া এক বিষয়, আর ফাতওয়া ও মাসআলা বলার ক্ষেত্রে নির্ভরযোগ্য হওয়া সম্পূর্ণ ভিন্ন বিষয়। এই গুণগুলোর পাশাপাশি যদি কেউ ফিকহ-ফাতওয়ায়ও বিজ্ঞ হন, তাহলে ভিন্ন কথা। কিন্তু ইতিহাসে তাদের সংখ্যা নিতান্তই নগণ্য। সুতরাং শুধু এসব গুণ ও সুখ্যাতির কারণেই যদি সকল ইলমি বিষয়ে কাউকে নির্ভরযোগ্য মনে করতে শুরু করি, তাহলে গোমরাহ হওয়া ছাড়া উপায় নেই। বরং ইসলামের ইতিহাসে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দেখা গেছে, যারা এত বে-খবর বুজুর্গ যে, দুনিয়ার বিষয়াশয় সম্পর্কে একদমই ধারণা রাখেন না তারা ফাতওয়া ও মাসআলা বলার ক্ষেত্রে নির্ভরযোগ্য হন না। তেমনিভাবে যারা বে-ইলম বা কম-ইলম পেশাদার ওয়ায়েজ, যারা অতি মাত্রায় সাহিত্য ও কাব্য চর্চা করেন, তারাও এ ক্ষেত্রে নির্ভরযোগ্য হন না। এজন্য সব যুগের উলামায়ে কেরাম এধরনের আলেমদের থেকে উম্মাহকে সতর্ক করেছেন। বিষয়টি খুবই সংক্ষেপে

বললাম। আশা করি কেউ ভুল বুঝবেন না, পূর্ণ কথা খেয়াল না করে অর্ধেক কথা নিয়ে কারো উপর আক্রমণ করে বসবেন না। এখানে বড় বুজুর্গ, বড় ওয়ায়েজ ও বড় লেখকের বিরুদ্ধে কিছু বলা হয়নি, তাদেরকে খাটোও করা হয়নি। শুধু বলা হয়েছে, এক বিষয়ে বড় হওয়া অন্য বিষয়ে বড় হওয়াকে অপরিহার্য করে না। সব শাস্ত্রের লোক আলাদা। এজন্য স্বীকৃত প্রবাদ আছে,

لكل فن رجال

‘প্রত্যেক শাস্ত্রের রয়েছে আলাদা লোক।’

সুতরাং এক শাস্ত্রে কেউ বড় হলেই, সব শাস্ত্রে তাকে বড় মনে করা বোকা। একজন ইঞ্জিনিয়ার তার ইঞ্জিনিয়ারিং-এ বড় হওয়ার কারণে যদি ডাক্তারিতেও আপনি তাকেই বড় মনে করেন এবং ডাক্তার বাদ দিয়ে তার প্রেসক্রিপশনে চিকিৎসা করেন, সেটা যেমন আত্মঘাতী পদক্ষেপ হবে, তেমনি একজন ওয়ায়েজ ওয়ায়েজ বড় হওয়ার কারণে যদি তাকে দ্বীনের সর্ব বিষয়ে বড় মনে করেন এবং ফাতওয়ায়ও আপনি তার উপরই নির্ভর করেন, তবে সেটাও হবে আপনার দ্বীনের জন্য আত্মঘাতী!

ইন্টারনেটে ইস্তেফতা

আজকাল ইলম অর্জনের অনেক বড় একটি মাধ্যম হয়ে উঠেছে ইন্টারনেট। এখানে আমাদেরকে যে বিষয়টি মনে রাখতে হবে তা হল, ইন্টারনেট ইলম অর্জনের উৎস নয়। এটা মূলত ইলম আদান-প্রদান ও সরবরাহের মাধ্যম। এটা এমন এক বিস্তৃত ও উন্মুক্ত মাধ্যম, যেখানে প্রবেশ করার এবং নিজেকে প্রকাশ করার অধিকার সবারই আছে। আস্তিক, নাস্তিক, প্রতারক, সত্যবাদি, মিথ্যাবাদি, শিক্ষিত, অশিক্ষিত সকলের অধিকার এখানে সমান। বরং এখনো পর্যন্ত তাতে সত্যবাদির চেয়ে মিথ্যাবাদি প্রতারক ও জাহেলের সংখ্যাই বেশি। সুতরাং ইন্টারনেট থেকে দ্বীন শেখার ক্ষেত্রে অনেক বেশি সতর্ক থাকা জরুরি। ইন্টারনেট থেকে ফাতওয়া বা মাসআলা নেয়া যাবে কি না? সেটা কথা নয়; কথা হচ্ছে ইন্টারনেটে যিনি ফাতওয়া দিচ্ছেন তিনি কে? তিনি আসলেই ফাতওয়া প্রদানের ক্ষেত্রে নির্ভরযোগ্য কি না? যদি নির্ভরযোগ্য বলে নিশ্চিত হওয়া যায় এবং মাঝপথে কোনো হস্তক্ষেপের স্বীকার না হয়ে অবিকৃত অবস্থায়

আপনার হতে আসে, তাহলে তা গ্রহণ করতে সমস্যা নেই। কিন্তু নেট থেকে গ্রহণের ক্ষেত্রে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দেখা যায়, আমরা এ বিষয়টির প্রতি লক্ষ রাখি না। যে-কেউ ইলম বিতরণের জন্য নেটে চলে আসেন আর আমাদের এক শ্রেণির ভাই তার পেছনেই পঙ্গপালের মতো ছুটে চলেন। যেকোনো অর্বাচীন ও গণ্ডমূর্খ জেনে বা না-জেনে দ্বীনের যে কোনো বিষয়ে মতামত দেয়, সেটার উপরই বাহ বাহ পাওয়া যায়, লাইক শেয়ার হয় লাগামহীন। আজই এক অনলাইন ‘সেলিব্রেটির’ একটি ভিডিও নজরে পড়ল। সম্ভবত অফলাইনেও তিনি সেরকম কিছু হয়ে উঠছেন! সামান্য একটু শুনেই দেখলাম, একটি আরবী বাক্যও তিনি শুদ্ধ করে পড়তে পারেন না। এমন সাধারণ সাধারণ জায়গায় ভুল করছেন, যে ভুলগুলো কওমি মাদরাসার আরবী প্রথম শ্রেণির কোনো ছাত্র করলে, তার আর দ্বিতীয় শ্রেণিতে উত্তীর্ণ হওয়ার সুযোগ নেই। অথচ এমন সেলিব্রেটির বয়ান শোনার জন্য আমাদের কয়েকশ ভাই হা করে বসে আছেন।

কথাগুলো একটু অসুন্দর লাগলেও অত্যন্ত বেদনার! কারণ এই অনাচারের যুগেও, শুধু ইসলাম ধর্ম ব্যতীত আর কোনো শাস্ত্রীয় বিষয়ে এমন লাগামহীনতা ও অরাজকতা আপনি পাবেন না। কিছু হলেও সেটার লাগাম টেনে ধরার ব্যবস্থা করা হয়। একমাত্র ইসলামের ক্ষেত্রেই আজ এমন এক পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে যেখানে সব মূর্খ ও জাহেল নিশ্চিন্তে হস্তক্ষেপ করছে। আসলে এগুলো সবই শরীয়াহ শাসন ও ইসলামী খেলাফত না থাকার অনিবার্য ফল। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে এই করুণ পরিস্থিতি থেকে আশু মুক্তির সুব্যবস্থা করুন

অপ্রয়োজনীয় প্রশ্ন না করা

যেকোনো প্রশ্ন করার পূর্বে আমাকে নিশ্চিত হতে হবে প্রশ্নটি প্রয়োজনীয় কি না? এই প্রশ্নের উত্তরের সঙ্গে আমার আমলের কোনো সম্পর্ক আছে কি না? আল্লামা তাকি উসমানি হাফিয়াহুল্লাহ এরকম অপ্রয়োজনীয় প্রশ্নের উদাহরণ দিতে গিয়ে লিখেছেন, ‘একবার রাতের বেলা ঘুমিয়ে পড়ার পর একজন আমাকে ফোন করে জিজ্ঞেস করছেন, হযরত! আসহাবে কাহাফের কুকুরের রংটা যেন কী ছিল? বললাম কেন ভাই, এটা কী দরকার? বললেন এই তো আমরা কয়েকজন বসে কথা বলছিলাম, হঠাৎ বিষয়টি নিয়ে বিতর্ক হল, ভাবলাম মাওলানাকে একটু জিজ্ঞেস করে নিই!’

আমাদের অনেকের মাঝেই এরকম অনর্থক প্রশ্নের পেছনে পড়ার প্রবণতা আছে। এভাবে আমরা নিজেদের সময় যেমন নষ্ট করি, যাদের সময় আমার সময়ের চেয়ে অনেক বেশি মূল্যবান, তাদের সময়ও নষ্ট করি। আসহাবে কাহাফের কুকুরের নাম কী ছিল? ওটা জাম্মাতে যাবে কি না? অমুসলিমদের নাবালেগ সন্তানরা জাম্মাতি, না জাহান্নামী? রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পিতা মাতা জাম্মাতি, না জাহান্নামী? মাগরিবের সালাত তিন রাকাত কেন? এবং এশার সালাত চার রাকাত কেন? এরকম আরও নানান আজগুবি আজগুবি প্রশ্ন। অথচ এগুলোর সাথে আমাদের আমলের কোনও সম্পর্ক নেই এবং এগুলো না জানলেও আমাদের কোনও ক্ষতির সন্তাবনা নেই। এরকম প্রশ্নের পেছনে পড়া আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খুবই অপছন্দ করতেন।

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- هَلْكَ الْمُتَنَطِّطُونَ. فَالْهَآ ثَلَاثًا.

“হযরত আব্দুল্লাহ রা. থেকে বর্ণিত, রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, অপ্রয়োজনীয় প্রশ্নকারীরা ধ্বংস হোক! কথাটি তিনি তিনবার বলেছেন।” —সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ৬৯৫৫

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- إِنَّ اللَّهَ يَرْضَى لَكُمْ ثَلَاثًا وَيَكْرَهُ لَكُمْ ثَلَاثًا فَيَرْضَى لَكُمْ أَنْ تَعْبُدُوهُ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَأَنْ تَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَيَكْرَهُ لَكُمْ قِيلَ وَقَالَ وَكَثْرَةُ السُّؤَالِ وَإِضَاعَةُ الْمَالِ. —صحيح مسلم:

4578

“হযরত আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, আল্লাহ তাআলা তোমাদের জন্য তিনটি বিষয় পছন্দ করেন। তিনটি বিষয় অপছন্দ করেন। তিনি পছন্দ করেন তোমরা আল্লাহর ইবাদত করবে, অন্য কাউকে তাঁর সঙ্গে শরিক করবে না এবং সকলে একসঙ্গে আল্লাহর রজ্জুকে আঁকড়ে ধরবে, পরস্পর বিচ্ছিন্ন হবে না। আর তিনি অহেতুক কথা বলা, (বিনা প্রয়োজনে) অধিক

প্রশ্ন করা এবং সম্পদ নষ্ট করা অপছন্দ করেন। -সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ৪৫৭৮

সালাফে সালাহীন এরকম অপ্রয়োজনীয় প্রশ্ন করলে অনেক নারাজ হতেন এবং তার উত্তর দিতেন না। ইমাম আহমাদ রহ.কে এক ব্যক্তি এমন প্রশ্ন করার পর, তাকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি মসজিদে প্রবেশের দোয়া জান? মসজিদে থেকে বের হওয়ার দোয়া জান? যাও সেগুলো শিখ! -উসূলুল ইফতা: ২৯১

জ্ঞানের উর্ধ্বে জটিল বিষয়ে প্রশ্ন না করা

ইলমের এমন কিছু জটিল স্তর আছে, যা সাধারণ মানুষের জ্ঞান ও যোগ্যতার উর্ধ্বে এবং ঈমান আমলের জন্য যেগুলোর বিশ্লেষণ তাদের জানার প্রয়োজন নেই। তাই তাদের জন্য ওসবের পেছনে পড়া এবং ওসব বিষয়ে প্রশ্ন করা ঠিক নয়। এতে তাদের দ্বীন ঝুঁকিতে পড়ার আশঙ্কা তৈরি হয়। আলেমদের জন্যও এসব বিষয় সাধারণ মানুষকে বলা নিষেধ। যেমন তাকদিরের বিশ্লেষণ। একজন মুমিনের ঈমানের জন্য এতটুকুই যথেষ্ট যে, পৃথিবীতে ভালো মন্দ যা ঘটে, সবই আল্লাহ পূর্ব থেকে নির্ধারণ করে রেখেছেন। যা যেভাবে নির্ধারণ করে রেখেছেন, তা সেভাবে ঘটাই অবধারিত। ব্যতিক্রম সম্ভব নয়। এর অতিরিক্ত তাকদিরের মাসআলার বিশ্লেষণ কঠিন, যা একজন সাধারণ মুমিনের জানার প্রয়োজনও নেই, অনেক ক্ষেত্রে তা বুঝার সাধ্যও তার নেই। আবু হাফস দিমাশকি রহ. (৭৭৫ হি.) রচিত তাফসীরুল লুবাবসহ আরও অনেক কিতাবে এসেছে,

سأل رجل علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - قال: يا أمير المؤمنين؛ أخبرني عن القدر فقال: طريقٌ مظلمٌ فلا تسلكه. فأعاد السؤال فقال: بحرٍ عميقٍ لا تلبجّه، فأعاد السؤال، فقال: "سِرُّ الله في الأرض، قد خفي عليك، فلا تفتشهُ". -اللباب في علوم الكتاب: 309/4

“জনৈক ব্যক্তি হযরত আলী রা.কে বলল, হে আমিরুল মুমিনিন! তাকদিরের বিশ্লেষণ করুন! তিনি বললেন, এটি বড় অন্ধকার পথ, তাতে চলতে যেও না! সে আবার প্রশ্ন করল। তিনি উত্তর দিলেন, এটি বড় গভীর

সমুদ্র, তাতে ডুব দিতে চেষ্টা করো না! প্রশ্নকারী আবাবো প্রশ্নের পুনরাবৃত্তি করল। এবার তিনি বললেন, এটি হল আল্লাহর যমিনে তাঁর এক রহস্য, যা তিনি তোমার কাছে গোপন রেখেছেন। সুতরাং তুমি তা ভেদ করার চেষ্টা করো না।” —আললুবাব: ৪/৩০৯

সহীহ বুখারীতে এসেছে,

وقال علي: حدثوا الناس، بما يعرفون أتحبون أن يكذب الله ورسوله. —صحيح

البخاري: 128

“হযরত আলী রা. বলেছেন, মানুষের সঙ্গে সেই ধরনের কথাই বলো, যা তারা বুঝতে পারে। তোমরা কি চাও, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করা হোক?” —সহীহ বুখারী: ১২৮

এছাড়াও সহীহ বুখারীসহ অসংখ্য হাদীসের কিতাবে খোদ রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে এমন একাধিক ঘটনা বর্ণিত আছে, যেখানে তিনি কোনো একজন সাহাবিকে একটি হাদীস বলেছেন, সাহাবী হাদীসটি মানুষের কাছে বলার অনুমতি চাইলে, তিনি নিষেধ করেছেন। বলেছেন না, সাধারণ মানুষকে এটি বললে বুঝবে না। তারা কথাটি না বুঝে আমল করাই ছেড়ে দিবে। তখন ওই সাহাবী সাধারণ মানুষের কাছে হাদীসটি বলা থেকে বিরত থাকেন। মৃত্যুর আগ মুহূর্তে হাদীসটি যেন হারিয়ে না যায় এ জন্য বর্ণনা করে গেছেন। ইমাম বুখারী রহ. এর উপর স্বতন্ত্র একটি অধ্যায় রচনা করেছেন, যার শিরোনাম, ‘সাধারণ মানুষের না বুঝার আশঙ্কায় বিশেষ কিছু লোককে ইলম দেয়া, অন্যদেরকে না দেয়া’। দেখুন সহীহ বুখারী, হাদীস নং ১২৭-১২৯।

سئل سفیان الثوري رحمه الله عن أطفال المشركين، فصاح بالسائل، وقال له: "يا

صبي! أنت تسأل عن ذا؟" —الأدب الشرعية والمنح المرعية: 72/2

“সুফিয়ান সাওরি রহ.-কে প্রশ্ন করা হল, মুশরিকদের শিশুদের সম্পর্কে (তারা জাহান্নামে যাবে না জাহান্নামে)? তিনি উচ্চস্বরে ধমক দিয়ে

বললেন, এই ছেলে! তুমি এ বিষয়ে প্রশ্ন করার কে?” –আলআদাবুশ শরইয়্যাহ ওয়াল মিনাখ্লে মারইয়্যাহ: ২/৭২

قال حبيب: كنا جلوساً عند زياد فأثاء كتاب من بعض الملوك بعد مدة، فكتب فيه ثم طبع الكتاب ونفذ به الرسول. فقال زياد أتدرون عم سأل صاحب هذا؟ سأل عن كفتي ميزان الأعمال يوم القيامة، من ذهب هي أم من ورق؟ فكتبت إليه، حدثنا مالك عن ابن شهاب، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. واسترد فتعلم. –ترتيب المدارك وتقريب المسالك: 124/1

“হাবীব রহ. বলেন, একবার আমরা যিয়াদ (বিন আব্দুর রহমান কুরতুবি)-এর নিকট বসা। ইতিমধ্যে কোনো এক বাদশার একটি পত্র এল। তিনি তার উত্তর লিখে সিল মেরে দূতমারফত পাঠিয়ে দিলেন। অতঃপর আমাদের জিজ্ঞেস করলেন, এই পত্র ওয়ালা কি লিখেছে জান? সে জানতে চেয়েছে, কেয়ামতের দিন আমল মাপার পাল্লা দুটি সোনার হবে, না রূপার হবে? আমি তাকে লিখে দিয়েছি, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ‘ইসলামের একটি সৌন্দর্য হল, অপ্রয়োজনীয় বিষয় পরিহার করা’। অচিরেই আপনি পাল্লার সম্মুখীন হবেন, তখনই বুঝতে পারবেন, কিসের হবে!” –তারতীবুল মাদারিক ওয়া তাকরিবুল মাসালিক: ২/১২৪

সংক্ষিপ্ত করতে গিয়েও খুব সংক্ষিপ্ত করা গেল না। বিষয়টি আসলে আরও দীর্ঘ আলোচনার দাবি রাখে। তবে এখানে বিস্তারিত আলোচনা করা গেল না। শুধু সালাফের কিছু উদ্ধৃতির উপর ইতি টানতে হল!

প্রশ্নে শুধু জরুরি তথ্য দেয়া

যেকোনো প্রশ্নের উত্তর নির্ভর করে প্রশ্নের উপর। প্রশ্নে প্রদত্ত তথ্যের উপর ভিত্তি করেই ঠিক হয়, তার উত্তর কী হবে? প্রশ্নে প্রয়োজনীয় তথ্য না থাকলে অনেক ক্ষেত্রে উত্তর দেয়া সম্ভব হয় না বা কঠিন হয়ে পড়ে। সুতরাং প্রশ্নে প্রয়োজনীয় তথ্য দিয়ে বিষয়টি একটু খুলে বলাই কাম্য। বিশেষ করে কিছু তথ্য আছে, যেগুলো একটু চিন্তা করলেই বোঝা যায়, উত্তরের জন্য এই তথ্যগুলো জরুরি।

যেমন একজন প্রশ্ন করল, আমি আমার বন্ধুর সঙ্গে যৌথ ব্যবসা করতে চাচ্ছি। এটা শরীয়তের দৃষ্টিতে জায়েয হবে কি?

এখানে একটু চিন্তা করলে খুব স্বাভাবিকভাবেই বুঝা যায় যে, যৌথ ব্যবসা অনেক রকম আছে। সুতরাং তিনি কী ধরনের যৌথ ব্যবসা করতে চাচ্ছেন? মূলধন কার? শ্রম কার? এবং লভ্যাংশ কীভাবে বন্টিত হবে? এ বিষয়গুলো উল্লেখ করা জরুরি। তা না হলে, হয় মুফতি সাহেবকে শরীয়াহ সম্মত যৌথ ব্যবসার যেকোনো একটি প্রকার উল্লেখ করে উত্তর দিতে হবে, যা হয়তো ওই ভাইয়ের জন্য উপযোগী নয়। অথবা যৌথ ব্যবসার সকল প্রকার উল্লেখ করে স্বতন্ত্র পুস্তিকা রচনা করে দিতে হবে, যা আদৌ কাম্য নয়।

অবশ্য অনেক সময় এমন কিছু তথ্য জানা দরকার হয়, যার সঙ্গে উত্তরের সম্পর্কটা একটু সূক্ষ্ম হয়, সাধারণ মানুষের বুঝার মতো হয় না। সেটা হয়তো প্রশ্ন করার পর মুফতি সাহেব জিজ্ঞেস করে জেনে নিবেন। (এ জন্য ইস্তেফতের সঙ্গে যোগাযোগের মাধ্যমও জানিয়ে রাখতে হয়।) কিন্তু যে তথ্যগুলো সবার বোঝার মতো, সেগুলো খেয়াল করে শুরু থেকেই উল্লেখ করা চাই।

আবার এমন কিছু বিষয় আছে, যেগুলোর সঙ্গে উত্তরের কোনো সম্পর্ক নেই। সেগুলো না বলা কাম্য। যেমন একজন প্রশ্ন করল, ‘আমার বন্ধু আরিফ একদিন আমাদের দু’জনেরই বন্ধু রাকিবের পকেট থেকে পাঁচশত টাকা চুরি করেছে। আমরা সন্দেহ করে তাকে মেরেছিও, কিন্তু সে স্বীকার করেনি। এখন আরিফের জন্য তা থেকে দায়মুক্ত হওয়ার উপায় কী?’

এখানে একটু চিন্তা করলেই বুঝা যায়, মাসআলা জানার জন্য এতটুকু কথাই যথেষ্ট ছিল যে, এক ব্যক্তি অপর ব্যক্তির কিছু অর্থ চুরি করেছে বা অন্যায়ভাবে ভক্ষণ করেছে। এখন তা থেকে দায়মুক্ত হওয়ার উপায় কি?

কিন্তু তা না করে, অপরাধী তার বন্ধু, যার নাম আরিফ; তার বন্ধু চুরি করেছে, তারা তাকে মেরেছে, এমন অনেকগুলো অহেতুক কথা বলার একদমই প্রয়োজন ছিল না। বরং এসব ক্ষেত্রে নাম-পরিচয় ও অপ্রয়োজনীয় নেতিবাচক তথ্যগুলো গোপন রাখাই কাম্য।

প্রয়োজনীয় তথ্য না দিয়ে অপ্রয়োজনীয় তথ্য প্রদানের ঘটনা সম্ভবত তালাকের ইস্তেফতায় সবচেয়ে বেশি ঘটে। কেউ তার স্ত্রীকে তালাক দেয়ার পর

যখন মুফতি সাহেবের কাছে দীর্ঘ পাঁচ পৃষ্ঠার লিখিত ইস্তেফতা নিয়ে হাজির হয়, পড়লে মনে হয় তা যেন কোনো প্রেমিক যুগলের জীবন্ত প্রেমকাহিনী নিয়ে লেখা উপন্যাস। প্রেমের সূচনা থেকে শুরু করে বিয়ে, ঝগড়া, তালাক পর্যন্ত সব কাহিনীই থাকে বিস্তারিত। থাকে না শুধু যে তথ্যের উপর ভিত্তি করে মাসআলা বলা হবে, সে তথ্যটি। সেখানে শুধু লেখা থাকে, ‘মাথা ঠিক ছিল না, তাই তিন কথা বলে ফেলেছি’। অথচ এখানে পাঁচ পৃষ্ঠার উপাখ্যান না লিখে, দেড় দুই লাইনে শুধু এতটুকু বলাই যথেষ্ট ছিল যে, আমি তালাক দেয়ার উদ্দেশ্যে কিংবা ভয় দেখানোর উদ্দেশ্যে রাগের মাথায় স্ত্রীকে এই এই কথা বলে ফেলেছি।

সুতরাং ইস্তেফতা করার সময় আমরা অবশ্যই খেয়াল করব, প্রয়োজনীয় কোনো তথ্য যেন বাদ না পড়ে এবং অপ্রয়োজনীয় কোনো তথ্য যেন ইস্তেফতায় না আসে।

ইখলাস ও সত্য গ্রহণের মানসিকতা

শরীয়তের কোনো বিষয় জানার জন্য প্রশ্ন করার উদ্দেশ্য কয়েকটি হতে পারে।

এক. ইলম অর্জন করা। যেমন একজন মুসলিম; মাসায়েল, হাদীস বা কোরআন শেখার জন্য একটু একটু প্রশ্ন করেন এবং একটু একটু করে শেখেন। তখন হয়তো এমন এমন বিষয়ও তার শেখা হয়, যার উপর এ মুহূর্তে তার আমল করার সুযোগ নেই। যেমন একজন গরীব মানুষ যখন হজ্জের মাসায়েল বা যাকাতের মাসায়েল শেখেন, তখন তার আপাত উদ্দেশ্য আমল করা থাকে না; বরং ইলম অর্জনই থাকে। এটাও অনেক বড় একটি নেক কাজ। রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا، سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ. -صحيح

مسلم: 2699

“যে ব্যক্তি ইলম অর্জনের পথে চলে, আল্লাহ তার জান্নাতের পথ সহজ করে দেন।” -সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ২৬৯৯

এছাড়াও ইলম অর্জনের আরও অনেক মর্যাদা আছে, যা আমরা অনেকেই জানি।

দুই. ইলম অর্জনের দ্বিতীয় উদ্দেশ্য হচ্ছে, উদ্ধৃত সমস্যায় করণীয় জেনে আমল করা। যেমন কেউ জোহরের নামায আদায় করার পর দেখল, তার কাপড়ে রক্তের দাগ লেগে আছে। এখন তার সংশয় হল, আমার নামায কি হয়েছে? এখন সে সমাধান জানার জন্য ইস্তেফতা করল, যেন এই মুহূর্তে তার করণীয় কী, তা জেনে আমল করতে পারে।

তিন. ইলম অর্জনের আরেকটি উদ্দেশ্য হল, দ্বীন ও শরীয়ত সম্পর্কে নিজের মধ্যে সৃষ্ট কোনো সংশয় দূর করা। যেমন একজন সাধারণ মানুষ হাদীসের অনুবাদ পড়েছেন। এক হাদীসে পড়লেন, কারো অন্তরে এক যাররা পরিমাণ অহঙ্কার থাকলে সে জাহান্নামে যাবে না। আরেক হাদীসে দেখলেন, যে ব্যক্তি ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ’ বলবে, সে জাহান্নামে যাবে। তার কাছে মনে হল, বাহ্যত হাদীস দু’টি পরস্পর বিরোধী। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কথা তো পরস্পর বিরোধী হতে পারে না। সুতরাং এখানে নিশ্চয়ই আমার বোঝার কোনো ভুল হচ্ছে। তখন সে এই সংশয় দূর করার জন্য কোনো আলেমের শরণাপন্ন হল।

সুতরাং আমরা যখন কোনো ইস্তেফতা করব, এরকম নেক উদ্দেশ্যে, মানার জন্য এবং আমল করার জন্য ইখলাসের সঙ্গে করব।

এছাড়াও অনেকে বিভিন্ন অন্যায় উদ্দেশ্যে প্রশ্ন করে থাকেন। যেমন অনেকে নতুন কোনো মাসআলা শিখলে মনে করেন, দেখি মাওলানা সাহেব জানেন কি না? অনেকে কাউকে আটকানোর উদ্দেশ্যে ধাঁধা টাইপের প্রশ্ন করেন। এগুলো অন্যায়। আরও ভয়ঙ্কর অন্যায় হল, অনেকে নিজের খাহেশ পূরণ করার উদ্দেশ্যে প্রশ্ন করেন। উত্তর মনমতো হলে মেনে নেন, অন্যথায় আরেকজনকে প্রশ্ন করেন। এভাবে নিজের মনমতো উত্তর পাওয়ার জন্য একজনের পর একজনকে প্রশ্ন করতে থাকেন। এগুলো মস্ত বড় অন্যায় এবং শরীয়ত মানার পরিবর্তে খাহেশের পূজা, যা কোনো এক স্তরে গিয়ে শিরকের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়।

ইমাম শাতেবি রহ. (৭৯০ হি.) বলেন,

ويتبين من هذا أن لكراهية السؤال مواضع نذكر منها عشرة مواضع

أحدها السؤال عما لا ينفع في الدين كسؤال عبد الله بن حذافة من أبي

والثاني أن يسأل بعد ما بلغ من العلم حاجته كما سأل الرجل عن الحج أكل عام مع أن قوله تعالى والله على الناس حج البيت قاض بظاهره أنه للأبد لا إطلاقه ومثله سؤال بني إسرائيل بعد قوله إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة

والثالث السؤال من غير احتياج إليه في الوقت وكان هذا والله أعلم خاص بما لم ينزل فيه حكم وعليه يدل قوله ذروني ما تركتكم وقوله

والرابع أن يسأل عن صعاب المسائل وشرارها كما جاء في النهي عن الأغلوطات والخامس أن يسأل عن علة الحكم وهو من قبيل التعبدات التي لا يعقل لها معنى أو السائل ممن لا يليق به ذلك السؤال كما في حديث قضاء الصوم دون الصلاة والسادس أن يبلغ بالسؤال إلى حد التكلف والتعمق وعلى ذلك يدل قوله تعالى قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين

والسابع أن يظهر من السؤال معارضة الكتاب والسنة بالرأي ولذلك قال سعيد أعراقى أنت

والثامن السؤال عن المتشابهات وعلى ذلك يدل قوله تعالى فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه الآية

والتاسع السؤال عما شجر بين السلف الصالح وقد سئل عمر بن عبد العزيز عن قتال أهل صفين فقال تلك دماء كف الله عنها يدي فلا أحب أن يطلخ بها لساني

والعاشر سؤال التعنت والإفحام وطلب الغلبة في الخصام وفي القرآن في دم نحو هذا ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وقال بل هم قوم خصمون وفي الحديث أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم هذه الجملة من المواضع التي يكره السؤال فيها يقاس عليها ما سواها

وليس النهي فيها واحدا بل فيها ما تشدد كراهيته ومنها ما يخف ومنها ما يحرم ومنها ما يكون محل اجتهاد. —الموافقات، طبع دار المعرفة بيروت، مع تحقيق عبد الله دراز: 321-319/4

“এতে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়, কিছু ক্ষেত্র এমন আছে, যেখানে প্রশ্ন করা অপছন্দনীয়। এমন দশটি ক্ষেত্র আমরা উল্লেখ করছি।

এক. এমন বিষয় জানতে চাওয়া, যা দ্বীনের কোনো উপকার বয়ে আনে না। যেমন (রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে উদ্দেশ্য করে) আব্দুল্লাহ ইবনে হুযাফা রাদিয়াল্লাহু আনহুর প্রশ্ন, ‘আমার পিতা কে?’

দুই. প্রয়োজন পরিমাণ ইলম হাসিল হওয়ার পর আরও প্রশ্ন করা। যেমন এক ব্যক্তি হজ্জের ব্যাপারে প্রশ্ন করেছিল, ‘হজ্জ কি প্রতি বছর ফরয?’ অথচ আল্লাহ তাযালার বাণী,

وَلِلّٰهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ

‘(যারা সেখানে পৌঁছার সামর্থ্য রাখে, এমন) মানুষের উপর আল্লাহর জন্য বাইতুল্লাহ’র হজ্জ করা ফরয।’ (সূরা আলে ইমরান (৩) : ৯৭)

উক্ত আয়াতটি কোনো প্রকার শর্ত ও বন্ধনমুক্ত হওয়ার কারণে, বাহ্যত হজ্জ জীবনে একবার ফরজ হওয়ার সিদ্ধান্তই দিয়েছে। এরূপ আরেকটি উদাহরণ হলো গাভী জবাই করার নির্দেশ দেয়ার পর গাভীর বিভিন্ন গুণাগুণ নিয়ে বনী ইসরাইলের অনর্থক প্রশ্ন। অথচ, আল্লাহ তাযালা বলে দিয়েছিলেন,

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَذْبَحُوا بَقَرَةً

(আল্লাহ তোমাদেরকে একটি গাভী জবাই করার আদেশ করছেন) (সূরা বাকারা (২) : ৬৭) [যার পর প্রশ্ন করার প্রয়োজন ছিল না।]

তিন. বর্তমানে প্রয়োজন নেই এমন বিষয়ে প্রশ্ন করা। প্রশ্নের ব্যাপারে তৃতীয় এই হুকুমটি –আল্লাহ তায়ালাই ভালো জানেন– সেসব মাসয়ালার সাথে বিশেষিত, যেগুলোর ব্যাপারে শরীয়তের কোনো বিধান এখনো আসেনি। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণী

ذروني ما ترككم

‘আমি তোমাদের যেখানে ছেড়ে দেই তোমরাও আমাকে সেখানেই ছেড়ে দাও! [অতিরিক্ত প্রশ্ন করো না]’ (সহীহ মুসলিম : ১৩৩৭) এটাই বুঝাচ্ছে।

চার. এমন সব জটিল ও অশোভন বিষয় জিজ্ঞেস করা, যেগুলো স্বভাবত ঘটার নয়। যেমন হাদীসে ধাঁধা থেকে নিষেধ করা হয়েছে।

পাঁচ. বিধানের ইচ্ছা ও কারণ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা। অথচ বিধানটি আল্লাহর পক্ষ থেকে দেওয়া এমন দায়িত্ব, যার অন্তর্নিহিত কারণ মানুষের বোধ বুদ্ধিরও উর্ধ্বে কিংবা প্রশ্নকারী এ ধরনের প্রশ্নের অনুপযুক্ত। যেমন (ঋতুমতী নারীর) সাওম কাযা করা ও সালাত কাযা না করার হাদীস।

ছয়. কৃত্রিমতা করে ও অনর্থক গভীরে গিয়ে প্রশ্ন করা। আল্লাহ তায়ালা বাণী

قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين

“(হে রাসূল! আপনি মানুষকে) বলুন, আমি এর (ইসলামের দাওয়াতের) কারণে তোমাদের কাছে কোনো পারিশ্রমিক চাই না এবং আমি কৃত্রিমতাকারীদের অন্তর্ভুক্ত নই।” (সূরা সাদ (৩৮) : ৮৬) উক্ত আয়াত থেকে বিষয়টি বুঝা যাচ্ছে।

সাত. এমন প্রশ্ন করা, যাতে নিজস্ব মতামতের ভিত্তিতে কুরআন সুন্নাহর বিরোধিতার চিত্র ফুটে ওঠে। এ কারণেই সাইদ ইবনুল মুসাইয়াব রহ. (এমন একজনকে) বলেছিলেন, তুমি কি ইরাকি? (কারণ ইরাকিদের

ব্যাপারে কথিত আছে, তারা হাদীসের মোকাবিলায় কিয়াস গ্রহণ করে)।

....

আট. ‘মুতাশাবিহাত’ সম্পর্কে জানতে চাওয়া। আল্লাহ তায়ালার বাণী

فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ

“আর যাদের অন্তরে বক্রতা আছে, তারা সেই মুতাশাবিহ আয়াতের পেছনে পড়ে।” (সূরা আলে ইমরান (৩) : ৭)

উক্ত আয়াতটি তা প্রমাণ করে।

নয়. সালাফে সালাহিনের মাঝে যেসব বিরোধ হয়েছিল, সেগুলো সম্পর্কে প্রশ্ন করা। উমর ইবনে আব্দুল আযিয রহ.কে জঙ্গে সিফফিন সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি উত্তর দিয়েছিলেন, সিফফিনে প্রবাহিত রক্ত থেকে আল্লাহ তায়ালার আমার হাত পবিত্র রেখেছেন। অতএব আমি চাই না, সেই রক্তে আমার জিহ্বা অপবিত্র হোক।

দশ. একগুঁয়েমি ও জেদবশত অথবা লা জওয়াব করা ও বিবাদে জয়ী হওয়ার জন্য প্রশ্ন করা। কুরআনে এ ধরনের ব্যক্তিদের নিন্দা করে বলা হয়েছে

ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام

“এবং মানুষের মধ্যে এমন কিছু লোক আছে, পার্থিব জীবন সম্পর্কে যার কথা তোমাকে মুগ্ধ করে, আর তার অন্তরে যা আছে, সে ব্যাপারে আল্লাহকে সাক্ষীও বানায়, অথচ সে ভীষণ কলহপ্রিয়।” (সূরা বাকারা (২) : ২০৪)

অন্যত্র এসেছে,

بل هم قوم خصمون

“ওরা বরং কলহপ্রিয় জাতি।” (সূরা যুখরুফ (৪৩) : ৪৯)

হাদীসে এসেছে

أَبْغَضَ الرِّجَالِ إِلَى اللَّهِ الْأُلْدَ الْخَصْمَ

“আল্লাহর কাছে সবচেয়ে অপছন্দনীয় হল, কলহপ্রিয় লোক।” (সহীহ
বুখারী : ২৪৫৭; সহীহ মুসলিম : ২৬৬৮)

এ হল এমন কিছু ক্ষেত্র, যেখানে প্রশ্ন করা অপছন্দনীয়। এগুলোর উপর
ভিত্তি করে বাকিগুলো বুঝে নিতে হবে।

তবে উপরোক্ত সবগুলোতে নিষেধাজ্ঞার মাত্রা সমান নয়। কোনোটা কঠিন,
কোনোটা হালকা। কোনোটা হারাম, কোনোটা ইজতিহাদি। -আল
মুয়াফাকাত : ৪/৩১৯-৩২১

আলেমের আদব বজায় রাখা

আলেম ও ইলমের প্রতি আদব প্রদর্শন ঈমানের অংশ। সুতরাং কোনো
আলেমের কাছে লিখিত বা মৌখিক ইস্তেফতা করলে, তার ভাষা ও সম্বোধনে
আলেমের প্রতি আদব ও শ্রদ্ধাবোধ থাকা জরুরি।

আল্লাহ তাআলা কোরআনে কারীমে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া
সাল্লামের সঙ্গে সামান্যতম বেয়াদবিকেও ইরতেদাদ ও ঈমান ধ্বংসের কারণ
হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। দেখুন, আল্লাহ তাআলা কীভাবে নবীয়ে কারীম
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সঙ্গে বেয়াদবির ভয়াবহতা চিত্রায়িত
করেছেন-

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْدِمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ
(1) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ
كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَنْ تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ (2) إِنَّ الَّذِينَ يَعْصُونَ
أَصْوَاتَهُمْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ أُولَئِكَ الَّذِينَ امْتَحَنَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ لِلتَّقْوَى لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ
عَظِيمٌ (3) إِنَّ الَّذِينَ يُنَادُونَكَ مِنَ الْحُجُرَاتِ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ (4). الحجرات

“হে মুমিনগণ! আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সম্মুখে তোমরা কোনো
বিষয়ে অগ্রণী হয়ো না এবং আল্লাহকে ভয় কর। আল্লাহ সর্বশ্রোতা,

সর্বস্ত। হে মুমিনগণ! তোমরা নবীর কণ্ঠস্বরের উপর নিজেদের কণ্ঠস্বর উঁচু
করো না এবং নিজেদের মধ্যে যেভাবে উচ্চস্বরে কথা বল, তাঁর সঙ্গে
সেরকম উচ্চস্বরে কথা বলো না। কারণ এতে তোমাদের কর্ম নিষ্ফল হয়ে
যাবে; অথচ তোমরা বুঝতেও পারবে না। যারা আল্লাহর রাসূলের সম্মুখে
নিজেদের কণ্ঠস্বর নীচু করে, আল্লাহ তাদের অন্তরকে তাকওয়ার জন্য
পরীক্ষা করে নিয়েছেন। তাদের জন্য রয়েছে ক্ষমা ও মহাপুরস্কার। যারা
কামরার বাইরে থেকে আপনাকে উচ্চস্বরে ডাকে, তাদের অধিকাংশই
নির্বোধ।” -সূরা হুজুরাত (৪৯) : ১-৪

উলামায়ে কেরাম যেহেতু আশ্বিয়ায়ে কেরামের ওয়ারিস ও প্রতিনিধি, তাই
উক্ত আয়াতের তাফসীরে মুফতী শফি রহ. বলেছেন-

علماء دين اور ديني مقتداؤں کے ساتھ بھی بھی ادب ملحوظ رکھنا چاہئے۔ -
معارف القرآن، ج: ۸، ص: ۱۰۰

“উলামায়ে দ্বীন ও দ্বীনের অনুসৃত ব্যক্তিদের সঙ্গেও একই রকম আদবের
খেয়াল রাখা চাই।” -মাআরেফুল কুরআন, খ. ৮, পৃ. ১০০

হাফেজ ইবনে আসাকির রহ. (৫৭১ হি.) বলেন-

إن لحوم العلماء مسمومة وعادة الله في هتك أستار منتقصيهم معلومة وأن من
أطلق لسانه في العلماء بالثلب ابتلاه الله قبل موته بموت القلب. - التبيان في آداب
حملة القرآن للنووي، دار ابن حزم، ص: ۲۹-۳۰

“উলামায়ে কেরামের গোশত বিষমিশ্রিত। আল্লাহ কর্তৃক তাঁদের মর্যাদা
ক্ষুণ্ণকারীদের লাঞ্চিত করার নিয়ম সকলেরই জ্ঞাত। যে আলেমদের
তিরস্কারে যবানদরাযি করে, আল্লাহ তাকে মৃত্যুর পূর্বেই অন্তরের মৃত্যুতে
আক্রান্ত করেন।” -আততিবইয়ান ফি আদাবি হামালাতিল কুরআন, ইমাম
নাবাবী রহ. পৃ. ২৯-৩০

ইমাম ইবনুস সালাহ রহ. (৬৪৩ হি.) বলেন,

ينبغي للمستفتي أن يحفظ الأدب مع المفتي ويبجله في خطابه وسؤاله، ونحو ذلك ولا يومئ بيده في وجهه، ولا يقول له: ما تحفظ في كذا وكذا؟ وما مذهب إمامك الشافعي في كذا وكذا؟

"ولا يقل" إذا أجابه: هكذا قلت أنا، "أو" كذا وقع لي، ولا يقل له: أفتاني فلان، أو أفتاني غيرك بكذا وكذا. ولا يقل إذا استفتى في رقعة: إن كان جوابك موافقاً لما أجاب فيها فكتبه، وإلا فلا تكتب. -ادب المفتي والمستفتي، مكتبة العلوم والحكم، المدينة المنورة، الطبعة الثانية 1423 هـ. ص: 168

“মুস্তাফতির উচিত তার প্রশ্ন ও সম্বোধন ইত্যাদিতে মুফতির সঙ্গে আদব বজায় রাখা এবং তাঁকে সম্মান প্রদর্শন করা। মুফতির সামনে আঙ্গুল নাড়িয়ে কথা বলবে না। এভাবে বলবে না যে, ‘আপনি এ বিষয়ে কী জানেন?’ এভাবেও প্রশ্ন করবে না যে, ‘এ বিষয়ে আপনার ইমাম শাফেঈর মাযহাব কী!’ মুফতির জবাব পেয়ে বলবে না, ‘হ্যাঁ, আমিও এরকমই ভাবছিলাম’। কোনো চিরকুটে ইস্তফতা করে বলবে না, ‘এখানে যেভাবে উত্তর আছে, আপনার উত্তর এরকম হলে লিখে দিন, অন্যথায় লিখবেন না’। -আদাবুল মুফতি ওয়াল মুস্তাফতি : ১৬৮

মানার জন্য দলিল তলব না করা

সাধারণ মানুষ সরাসরি কোরআন-সুন্নাহ থেকে সব বিষয়ের ইলম উদ্ঘাটন করতে পারে না। সুতরাং তারা কীভাবে কোরআন-সুন্নাহর অনুসরণ করবে?

এ প্রশ্নের খুব স্বভাবজাত উত্তর, যিনি কোরআন সুন্নাহ’র বিশেষজ্ঞ, তার নির্দেশনার আলোকে কোরআন সুন্নাহ’র অনুসরণ করবে। ঠিক যেমন একজন রোগীকে চিকিৎসা করতে হয়, চিকিৎসা বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের নির্দেশনা মেনে। এখানে ডাক্তারের অনুসরণ যেমন প্রকৃত অর্থে তার অনুসরণ নয়; বরং ডাক্তারের পরামর্শক্রমে চিকিৎসা বিজ্ঞানেরই অনুসরণ, ঠিক তেমনি একজন আলেমের নির্দেশনা অনুযায়ী কোরআন সুন্নাহর অনুসরণও প্রকৃত অর্থে তার অনুসরণ নয়; বরং কোরআন সুন্নাহ’রই অনুসরণ। রোগী ডাক্তারের নির্দেশনা

বাদ দিয়ে এবং যথানিয়মে কোনো বিজ্ঞ চিকিৎসকের তত্ত্বাবধানে চিকিৎসা বিজ্ঞান না শিখে, নিজে সরাসরি চিকিৎসা বিজ্ঞানের বই পড়ে নিজের চিকিৎসা শুরু করলে যেমন তার জীবন ঝুঁকিতে পড়বে, তেমনি একজন মুসলিমও যদি যথানিয়মে কোনো বিশেষজ্ঞ আলেমের নির্দেশনা উপেক্ষা করে এবং বিজ্ঞ আলেমের তত্ত্বাবধানে ইলম না শিখে, সরাসরি কোরআন সুন্নাহ পড়ে অনুসরণ শুরু করে, তখন তার ঈমান-আমলও ঝুঁকিতে পড়ে যায়। এটি শুধু শরীয়াহ'র ইলমের নীতি নয়; পৃথিবীর সকল শাস্ত্রের স্বভাবজাত স্বীকৃত নীতি। এই নীতি উপেক্ষা করে কারো পক্ষেই কোনো শাস্ত্রের যথার্থ অনুসরণ সম্ভব নয়।

শুধু একটি পার্থক্য আছে। চিকিৎসার ক্ষেত্রে ডাক্তারের জন্য তার মতো আরেকজন ডাক্তারের আবিষ্কার বাদ দিয়ে নিজ থেকে চিকিৎসা দেয়ার সুযোগ আছে এবং ক্ষেত্রবিশেষ দেনও। কিন্তু একজন আলেমের জন্য কোরআন-সুন্নাহ উপেক্ষা করে নিজ থেকে কোনো নির্দেশনা দেয়ার অধিকার নেই বলে তিনি তা করেন না।

কিন্তু দুঃখজনক বিষয় হচ্ছে, আজ এই স্বভাবজাত সরল সত্যটিও অনেকে অস্বীকার করতে চান। তারা মনে করেন, আজকাল সবকিছুই অনুবাদ পাওয়া যায়। সুতরাং সাধারণ মানুষ আরবী না বুঝলেও অনুবাদ পড়েই সরাসরি কোরআন-সুন্নাহ অনুসরণ করতে পারেন; আলেমের শরণাপন্ন হওয়ার প্রয়োজন নেই।

কিন্তু তারা চিন্তা করেন না যে, অনুবাদটাও একটা মাধ্যম এবং এই অনুবাদটা ঠিক হল কি না, তার জন্য তো আমাকে অনুবাদকের মাধ্যমই গ্রহণ করতে হবে এবং তার উপর আস্থার ভিত্তিতেই বিশ্বাস করতে হচ্ছে। সুতরাং এটা সরাসরি কোরআন-সুন্নাহ থেকে গৃহীত ইলম হল কিভাবে? এটাও তো আলেমের মাধ্যমেই হল এবং আলেমের উপর আস্থার ভিত্তিতেই হল!

তারা এটাও চিন্তা করেন না যে, ভাষা বোঝা আর সেই ভাষা যে বিধি বিধান বহন করে, তা বোঝা এক কথা নয়। তাই যদি হত তাহলে মানুষের হেদায়াতের জন্য সকল কিতাবের সঙ্গে নবী প্রেরণের প্রয়োজন ছিল না। সাহাবায়ে কেরামের মতো ভাষাবিদদের কোরআন সুন্নাহ বুঝতে কখনো ভুল হত না। তাঁদেরকে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শরণাপন্ন হতে হত না। যাদের মাতৃভাষা আরবী, তাদের আলেম হওয়ার জন্য কারো

কাছে পড়াশোনা করতে হত না। শুধু ভাষা বুঝলেই যদি সেই ভাষার সব বার্তা বুঝা যেত, তাহলে পৃথিবীতে এত স্কুল-মাদরাসা, ভার্টিসিটি-জামিয়া ও এত এত শিক্ষকের প্রয়োজন হত না। শুধু ভাষা শেখার বিদ্যালয় থাকলেই যথেষ্ট হত। ভাষা শেখার পর কাক্সিত শাস্ত্রের বই পড়ে পড়েই সবাই বিশেষজ্ঞ হয়ে যেতে পারত। কিন্তু কোনো শাস্ত্রেই এর নজির নেই; আছে শুধু ইসলামী শরীয়াহ'য়। তাই তো আমাদের কোনো কোনো ভাই কিছুদিন কোরআন-হাদীসের অনুবাদ পড়েই বিশেষজ্ঞ বলে যাচ্ছেন এবং উম্মতের পথ প্রদর্শনের গুরু দায়িত্ব নিজের কাঁধে তুলে নিচ্ছেন!

তো যে কথাটি বলতে চাচ্ছি, সাধারণ মুসলমানদের জন্য কোরআন সুন্নাহ অনুসরণের একমাত্র পদ্ধতি হল, সং ও বিজ্ঞ নির্ভরযোগ্য আলেমের নির্দেশনা অনুসরণ করা। সুতরাং সাধারণ মুসলমানদের দায়িত্ব হল, এমন আলেম খুঁজে বের করা, যার মধ্যে উপরে আলোচিত মৌলিক দুটি গুণ বিদ্যমান। তিনি সংশ্লিষ্ট বিষয়ে বিজ্ঞ, পাশাপাশি সং ও মুত্তাকি। যিনি পারিপার্শ্বিক কোনো কারণে কখনো মিথ্যা কিংবা প্রতারণার আশ্রয় নেবেন না। এমন ব্যক্তি যখন কোনো বিষয়ে ফাতওয়া দেবেন, মুস্তাফতির দায়িত্ব হল, তার উপর আস্থার ভিত্তিতেই তা মেনে নেয়া। তা মানার জন্য বা গ্রহণ করার জন্য দলিল না চাওয়া। এটাই ইলম ও আলেমের যথার্থ আদব।

মুফতি সাহেব যদি ভুল ফাতওয়া দেন!

কিন্তু প্রশ্ন হল, আমি দলিল প্রমাণ জিজ্ঞেস করলাম না; বরং মুফতি সাহেবের উপর আস্থার ভিত্তিতেই মেনে নিলাম, কিন্তু তিনি যদি ভুল ফাতওয়া দেন, তাহলে কী হবে? বলা বাহুল্য, আমার মুফতি নির্বাচন যদি যথার্থ হয় তাহলে তাঁর ভুল খুব বেশি হবে না, হলেও বারবার হবে না। ঘটনাক্রমে এক দু'বার হবে। যা সাহাবায়ে কেরাম থেকে শুরু করে সর্ব যুগের সকল বড় বড় আলেমেরও হয়েছে এবং মানুষ হিসেবে সকলেরই এমন ভুল হওয়া অবশ্যস্বাভাবিক।

দ্বিতীয়ত, এটার সমাধান দলিল জানতে চাওয়া নয়। কারণ আপনি দলিল জিজ্ঞেস করার পর তিনি যে দলিল দিবেন, সেটাও আপনাকে তার উপর আস্থার ভিত্তিতেই মানতে হবে। কারণ আপনি আরবী বুঝেন না। তাছাড়া তিনি

যদি খেয়ানতই করেন, তাহলে নিজ থেকে কোনো দলিল বানিয়ে হাদীস বলে চালিয়ে দিলে আপনার কী করার আছে? সুতরাং তার উপর আস্থা রাখা ছাড়া অন্য কোনো গতি আপনার নেই, একথা আপনাকে মানতেই হবে।

তৃতীয়, এবিষয়ে শরীয়তের নির্দেশনা হল, আলেম যদি যোগ্য হন এবং মাসআলার সঠিক সমাধানে পৌঁছার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করেন, তাহলে ঘটনাক্রমে তার সিদ্ধান্ত ভুল হলেও চেষ্টার জন্য তিনি একটি সওয়াব পাবেন। আর সঠিক হলে দুটি সওয়াব পাবেন। রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন,

إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله

أجر. -صحيح البخاري، رقم: 7352

“হাকেম যখন ইজতিহাদ করে সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত হন, তিনি দুটি সওয়াব পান। আর যদি ভুল সিদ্ধান্তে উপনীত হন, একটি সওয়াব পান।” –

সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৭৩৫২

উলামায়ে কেরাম বলেছেন, হাকেম ও মুফতির বিধান এক্ষেত্রে একই।

আর একজন সাধারণ মুসলিম যদি নির্ভরযোগ্য আলেম নির্বাচনে ত্রুটি না করে তার শরণাপন্ন হন, তখন ঘটনাক্রমে তিনি ভুল ফাতওয়া দিলেও, উক্ত ব্যক্তি না জেনে তা আমল করলে, আল্লাহর কাছে তিনি দায়মুক্ত হবেন ইনশাআল্লাহ।

এখানে মাওলানা আব্দুল মালেক হাফিয়াহুল্লাহ রচিত ‘উম্মাহর ঐক্য: পথ ও পন্থা’ থেকে একটি উদ্ধৃতি তুলে ধরছি। আশা করি সংশ্লিষ্ট বিষয়ে সুন্দর নির্দেশনা পাবেন ইনশাআল্লাহ। উক্ত বইটি আলেম, তালিবে ইলমসহ সকল মুসলিমের পড়া উচিত। উম্মাহর ঐক্য, ইলম ও মতভেদের আদব ও নীতি সম্পর্কে সমসাময়িক প্রেক্ষাপটে একটি অদ্বিতীয় গ্রন্থ।

তিনি বলেন,

“...আলেমদের মাঝে মতভেদ হলে আম মানুষ কী করবে?”

এই প্রশ্ন এখন মানুষের মুখে মুখে। আমল থেকে গা বাঁচানোর জন্য এবং ভুল থেকে ফিরে আসার সংকল্প না থাকলে অতি নিরীহভাবে এই অজুহাত দাঁড় করানো হয় যে, আমাদের কী করার আছে? আলিমদের মাঝে এত মতভেদ, আমরা কোন দিকে যাবো। কার কথা ধরব, কার কথা ছাড়ব?

আমার আবেদন এই যে, আমরা যেন এই অজুহাত দ্বারা প্রতারিত না হই। এটি একটি নফসানী বাহানা এবং শয়তানের ওয়াসওয়াসা। নিচের কথাগুলো চিন্তা করলে এটা যে শয়তানের একটি ধোঁকামাত্র তা পরিষ্কার বুঝে আসবে।

১. জরুরিয়াতে দ্বীন, অর্থাৎ দ্বীনের ঐ সকল বুনিয়াদী আকীদা ও আহকাম এবং বিধান ও শিক্ষা, যা দ্বীনের অংশ হওয়া স্বতঃসিদ্ধ ও সর্বজনবিদিত, যেগুলো মুসলিম উম্মাহর মাঝে সকল যুগে সকল অঞ্চলে ব্যাপকভাবে অনুসৃত, যেমন আল্লাহর উপর ঈমান, তাওহীদে বিশ্বাস, আখিরাতের উপর ঈমান, কুরআনের উপর ঈমান, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং তাঁর হাদীস ও সুন্নাহর উপর ঈমান, মুহাম্মাদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আখেরি নবী ও রাসূল হওয়ার উপর ঈমান, পাঁচ ওয়াক্ত ফরয নামায, জুমার নামায, যাকাত, রোযা, হজ্জ, পর্দা ফরয হওয়া, শিরক, কুফর, নিফাক, কাফির-মুশরিকদের প্রতীক ও নিদর্শন বর্জনীয় হওয়া, সুদ, ঘুষ, মদ, শূকর, ধোঁকাবাজি, প্রতারণা, যা জরুরিয়াতে দ্বীনের মধ্যে शामिल হওয়াতে আলিমদের মাঝে তো দূরের কথা, আম মুসলমানদের মাঝেও কোন মতভেদ নেই। যারা দ্বীনের এই সকল স্বতঃসিদ্ধ বিষয়কেও বিশ্বাস ও কর্মে অনুসরণ করে না তারাও বলে; বরং অন্যদের চেয়ে বেশিই বলে যে, আলিমদের মাঝেই এত মতভেদ তো আমরা কী করবো!

২. অসংখ্য আমল, আহকাম ও মাসাইল এমন আছে, যেগুলোতে আলিমদের মাঝে কোন মতভেদ নেই। এগুলোকে ইজমায়ী আহকাম বা সর্বসম্মত বিধান হিসেবে গণ্য করা হয়। কিছু মানুষ এসব বিষয়েও নতুন

মত ও পথ আবিষ্কার করে, এরপর আলিমদের অভিযুক্ত করে যে, তারা এখানে দ্বিমত করেছেন!

৩. আল্লাহ তাআলা যাকে বিচার-বিবেচনার সামান্য শক্তিও দিয়েছেন তিনি যদি আল্লাহকে হাজির-নাজির জেনে সত্য অন্বেষণের নিয়তে জরুরিয়াতে দ্বীন (স্বতঃসিদ্ধ বিষয়াদি) এবং মুজমা আলাইহ (সর্বসম্মত বিষয়সমূহ) সামনে নিয়ে চিন্তা করেন তাহলে খুব সহজেই বুঝতে পারবেন যে, বাতিলের পক্ষাবলম্বনকারীরা ‘আলিম’ (জ্ঞানী) নন; বরং হাদীসের ভাষায় *عليهم اللسان* ‘বাকপটু’। এই শ্রেণীর লোকদের প্রভাব থেকে মুক্ত থাকলে আহলে হক আলিমদেরকে, যারা ‘আসসুন্নাহ’ ও ‘আলজামাআ’র নীতি-আদর্শের উপর আছেন, চিনে নিতে দেবী হবে না। এরপর তাদের সাহচর্য অবলম্বন করলে তিনি তো নিন্দিত মতভেদ থেকে বেঁচেই গেলেন। আর বৈধ মতভেদপূর্ণ বিষয়াদিতে তিনি যদি তার দৃষ্টিতে বিশ্বস্ত ও নির্ভরযোগ্য আলিমদের নির্দেশনা অনুসরণ করেন তাহলে কোন অসুবিধা নেই। ইনশাআল্লাহ আখিরাতে তিনি দায়মুক্ত থাকবেন।

৪. কুরআন হাদীসের বাণী ও ভাষ্য থেকে প্রাপ্ত কিছু চিহ্ন ও আলামত আছে, যেগুলোর সাহায্যে ঈমানদারির সাথে চিন্তা-ভাবনা করে কেউ কোন আলিমকে নির্বাচন করতে পারেন, যার সাহচর্য তিনি গ্রহণ করবেন এবং যার সাথে দ্বীনী বিষয়ে পরামর্শ করবেন।

সময় করে আলিমদের মজলিসে যান, তাঁদের কাছে বসুন এবং লক্ষ্য করুন, যেসব আমল সর্বসম্মত, যে বিষয়গুলো সর্বসম্মতভাবে সুন্নাহ, এমন বিষয়ের অনুসরণ আর যে বিষয়গুলো সর্বসম্মতভাবে নাজায়েয ও বিদআত তা বর্জনের বিষয়ে কে বেশী ইহতিমাম করেন, কার সাহচর্য দ্বারা নাফরমানী সম্পর্কে অন্তরে ভয় ও ঘৃণা সৃষ্টি হয় এবং কার সঙ্গীদের অধিকাংশের অবস্থা এসব ক্ষেত্রে ভালো; কে পূর্ণ সতর্কতার সাথে গীবত থেকে বেঁচে থাকেন এবং প্রতিপক্ষের সাথেও ভালো ব্যবহারের আদেশ দেন; কার কথা থেকে বোঝা যায় কুরআন হাদীসের ইলম তার বেশী, কার কথায় নূর ও নূরানিয়াত বেশী; তেমনি যে আলিমগণ সর্বসম্মতভাবে হকের উপর প্রতিষ্ঠিত তাঁরা কাকে সমর্থন করেন। এ ধরনের নিদর্শনগুলোর আলোকে বিচার করার পর কেউ যদি সালাতুল হাজত পড়েন, আল্লাহর

দরবারে দুআ করেন, ইসতিখারা করেন, এরপর নেক নিয়তের সাথে কোন আলিমকে নির্বাচন করেন তাহলে ইনশাআল্লাহ তাআলা তিনি দায়মুক্ত হবেন।

তবে এক্ষেত্রেও জরুরি মনে করা যাবে না যে, সবাইকে ওই আলিমের কাছেই মাসআলা জিজ্ঞাসা করা উচিত এবং তারই কাছ থেকে পরামর্শ নেওয়া উচিত। তদ্রূপ মতভেদপূর্ণ বিষয়াদিতে এসব লোকদের সাথে তর্ক-বিতর্কে লিপ্ত হওয়া যাবে না, যারা অন্য আলিমদের ফাতওয়া ও নির্দেশনা অনুযায়ী আমল করেন। অন্য কেউ যদি আল্লাহর রেযামন্দির জন্য চিন্তা-ভাবনা করে অন্য কোন আলিমকে তার দ্বীনী রাহনুমা বানান তাহলে আপনার আপত্তি না থাকা উচিত, না তার সাথে আপনার তর্ক বিতর্ক করা সমীচীন আর না আপনার সাথে তার।

যে আলিমদেরকে আপনি নির্বাচন করেননি তাদের সম্পর্কে কুখারণা পোষণ করা কিংবা তাঁদের সম্পর্কে কটুক্তি করা কোনটাই জায়েয নয় এবং বিনা দলীলে তাদের কাউকে বাতিল মনে করাও বৈধ নয়।” -উম্মাহর ঐক্য: পথ ও পন্থা: ১৮২-১৮৪

অবশ্য অন্য কারণে দলিল চাইতে পারবে

অবশ্য অন্য কোনো কারণে দলিল জানতে চাইলে চাইতে পারেন। যেমন বিষয়টি ভালোভাবে হৃদয়ঙ্গম করার জন্য অথবা অতিরিক্ত ইতমিনান ও স্বস্তি অর্জনের জন্য বা এজাতীয় অন্য কোনো উদ্দেশ্যে। তবে দলিল চাইলেই মুফতি সাহেবের জন্য দলিল দেয়া আবশ্যিক নয়। বরং দলিল যদি সহজ সরল হয় এবং সাধারণ মানুষের বোধ ও অনুধাবনের আওতায় হয়, তাহলে দিবেন। পক্ষান্তরে দলিলটি যদি ইজতিহাদনির্ভর হয় এবং সাধারণ মানুষের বোধবুদ্ধির উর্ধ্বে হয়, তাহলে দলিল দেয়া থেকে বিরত থাকবেন।

ইবনুস সালাহ রহ. (৬৪৩ হি.) বলেন,

لا ينبغي للعامي أن يطالب المفتي بالحجة فيما أفتاه به، ولا يقول له: لم وكيف؟ فإن أحب أن تسكن نفسه بسماع الحجة في ذلك، سأل عنها في مجلس آخر أو في ذلك المجلس بعد قبول الفتوى مجردة عن الحجة.

وذكر السمعاني: أنه لا يمنع من أن يطالب المفتي بالدليل لأجل احتياطه لنفسه، وأنه يلزمه أن يذكر له الدليل إن كان مقطوعاً به، ولا يلزمه ذلك إن لم يكن مقطوعاً به لافتقاره إلى اجتهاد يقصر عنه العامي². والله أعلم. "بالصواب"³. ادب المفتي والمستفتي، مكتبة العلوم والحكم، المدينة المنورة، ص: 171

“সাধারণ মানুষের জন্য মুফতি যে ফাতওয়া প্রদান করবেন, তার দলিল তলব করা ঠিক নয়। সে বলবে না, এটা কেন? কিভাবে? অবশ্য কেউ যদি দলিলের মাধ্যমে ইতমিনান (প্রশান্তি) ও স্বস্তি অর্জন করতে চায়, তবে পরে অন্য কোনো মজলিসে দলিল জেনে নেবে অথবা উক্ত মজলিসে দলিল ব্যতীত ফাতওয়াটি গ্রহণ করার পর আলাদা করে দলিল জানতে চাইবে। সামআনি রহ. বলেছেন, ‘মুস্তাফতিকে নিজের সতর্কতার জন্য মুফতির কাছে দলিল তলব করতে নিষেধ করা যাবে না। তবে দলিল যদি অকাটি ও সুস্পষ্ট হয়, তবেই তা উল্লেখ করা মুফতির জন্য জরুরি হবে। অন্যথায় তা উল্লেখ করা মুফতির জন্য জরুরি নয়। কারণ তা বুঝার জন্য ইজতিহাদ প্রয়োজন, যার সামর্থ্য সাধারণ মানুষের নেই। আল্লাহই সর্বাধিক জ্ঞাত।’-আদাবুল মুফতি ওয়াল মুস্তাফতি: ১৭১

ইমাম কারাফি রহ. (৬৮৪ হি.) বলেন,

ولا ينبغي للمفتي: أن يحكي خلافاً في المسألة لئلا يُشَوِّشَ على المستفتي، فلا يدري بأي القولين يأخذ، ولا أن يذكر دليلاً، إلا أن يعلم أنَّ الفُتْيَا سَيُكْرَهُهَا بعضُ الفقهاء، ويقعُ فيها التنازعُ، فيَقْصِدُ بذلك بيانَ وجهِ الصوابِ لغيره من الفقهاء، الذي يَتَوَهَّمُ مُنَازَعَتَهُ، فيَهْتَدِي به، أو يَحْفَظُ عِرْضَهُ هو عن الطعن عليه. وأما متى لم يكن إلَّا مجردُ الإسترشاد من السائل فليقتصر على الجواب من غير زيادة. -الإحكام

“মুফতির জন্য মাসআলার মতভেদ উল্লেখ করা ঠিক নয়। যাতে মুস্তাফতি পেরেশান না হয়, কোন মতটি সে গ্রহণ করবে? মাসআলার দলিলও উল্লেখ করবে না।... তবে যদি মনে করেন ফাতওয়াটি ফকিহদের কেউ প্রত্যাখ্যান করতে পারেন এবং তাতে বিতর্ক হতে পারে, তাহলে যেসব ফকিহের বিতর্ক করার আশঙ্কা আছে, তাদের জন্য ফাতওয়াটির যথার্থতার কারণ ও দলিল বলে দেবেন, যাতে তারা বুঝতে পারেন। অথবা ভুলের অপবাদ থেকে নিজের ইজ্জত রক্ষার জন্য দলিল উল্লেখ করবেন। পক্ষান্তরে যেখানে শুধু মুস্তাফতির পথপ্রদর্শন উদ্দেশ্য, সেখানে শুধু উত্তর দেবেন, অতিরিক্ত কিছু বলবে না।” -আলইহকাম: ২৪৯

উত্তর পাওয়ার পর অন্যজনকে প্রশ্ন না করা

কিছু মানুষ আছে সংশয়পূর্ণ স্বভাবের। সবকিছুতেই তারা সংশয় প্রকাশ করেন এবং বারবার একই বিষয়ের পুনরাবৃত্তি করেন। সুযোগ পেলেই যাকে তাকে প্রশ্ন করতে থাকেন। আবার কিছু মানুষ আছে অতি উৎসাহী ও অতি কৌতূহলী। তারাও প্রয়োজনে অপ্রয়োজনে সুযোগ পেলেই প্রশ্ন করতে চান। অতি মাত্রার এই স্বভাবগুলো এমনিতেই শরীয়ত পছন্দ করে না। একজন নির্ভরযোগ্য আলেম থেকে ফাতওয়া নেয়ার পর কোনো যৌক্তিক কারণ ছাড়া অহেতুক সংশয় ও কৌতূহলবশত অন্য আলেমকে প্রশ্ন করা ঠিক নয়। এতে নিজের বিপদ বাড়ার সম্ভাবনা থাকে। আল্লাহ না করুন, তিনি যদি ভিন্ন ফাতওয়া দেন, তখন আমি কোনটা গ্রহণ করব, এমন একটি নতুন বিপদের মুখোমুখি আমাকে হতে হতে পারে! অথচ দ্বিতীয়জনকে জিজ্ঞেস না করে প্রথম ফাতওয়ার উপর আমল করাই আমার জন্য ইহকাল ও পরকালের বিচারে যথেষ্ট ছিল।

উত্তরে যৌক্তিক সংশয় হলে করণীয়

অবশ্য উত্তর পাওয়ার পর কোনো যৌক্তিক কারণেই যদি সংশয় হয় যে, উত্তরটি মনে হয় সঠিক হয়নি, তাহলে প্রথম দায়িত্ব হল সম্ভব হলে আদবের সঙ্গে উক্ত আলেমের কাছে নিজের সংশয়টি পেশ করা। অনেক ক্ষেত্রে আশা করি তাতে ভালো একটি সমাধান চলে আসবে ইনশাআল্লাহ। কিন্তু তাতেও যদি সমাধান না হয়, তাহলে দুটি পথই তার সামনে খোলা। বিজ্ঞ আলেমের উত্তরে সাধারণ মানুষের সংশয় ধর্তব্য নয়। এজন্য সে ইচ্ছা করলে সংশয় সত্ত্বেও তার উপর আমল করতে পারে। তবে উত্তম হল অন্য কোনো আলেমকে প্রশ্ন করে সংশয় নিরসন করে নেয়া।

আল্লামা ইবনে নুজাইম রহ. (৯৭০ হি.) বলেন,

إن لم يطمئن نفسه (أي نفس المستفتي) إلى جواب المفتي، استحسب سؤال غيره، ولا يجب. — ما وجدت النص في كتب ابن نجيم رحمه الله في عجالة بحثي في المكتبة الشاملة الالكترونية، ولم تنح لي الفرصة أكثر من هذا، فنقلت النص من اصول الفتاء، ص: 333، يقول فيه الشيخ العثماني: "قال ابن نجيم رحمه الله إن لم يطمئن... الخ" والأمر معقول لا يحتاج إلى دليل.

“মুফতির উত্তরে যদি মুস্তাফতির ইতমিনান ও স্বস্থি না হয়, তবে উত্তম হল অন্যকে প্রশ্ন করা। তবে তা জরুরি নয়।”

উল্লেখ্য, এখানে সংশয়ের কথা বলা হয়েছে। অর্থাৎ মুফতি সাহেবের উত্তরে যদি সংশয় সৃষ্টি হয়, তাহলে মুস্তাফতির করণীয় উপরে যেমনটি বলা হল। পক্ষান্তরে বিষয়টি যদি সংশয়যোগ্য না হয়ে শরীয়তের সর্বজনবিদিত কাতঈ ও অকাট্য জরুরিয়াতে দ্বীনের কোনো বিষয় হয়। যা আলেম ও সাধারণ মুসলমান সবার কাছেই সুস্পষ্ট, যা ইজতেহাদি নয় এবং যেখানে কোনো ধরনের ভুল শরীয়তে একদমই গ্রহণযোগ্য নয়। যেমন একজন বলল, রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও সাহাবায়ে কেরাম দ্বীনের জন্য কোনো সশস্ত্র যুদ্ধ-জিহাদ করেননি (নাউযুবিল্লাহ)। কিংবা কেউ বলল, নামায মনে মনে আদায় করলেই যথেষ্ট। তাহলে এসব বিষয়ে যত বড় ব্যক্তিই ফতোয়া দেন না কেন, কারো জন্যই তা মানার সুযোগ নেই। এমন ফাতওয়া দিলে মুফতি যেমন

ঈমানহারা হবেন, তা গ্রহণ করলে মুস্তাফতিও ঈমানহারা হবেন। মুফতির দোহাই দিয়ে বাঁচার সুযোগ থাকবে না। আর যিনি এমন ফাতওয়া দিবেন, তিনিও সঙ্গে সঙ্গে তার গ্রহণযোগ্যতা হারাবেন। দ্বীনি বিষয়ে তার শরণাপন্ন হওয়া এবং তার উপর আস্থা রাখার কোনো সুযোগ থাকবে না। রাসূলে কারীম পরিষ্কার বলেছেন,

لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. -المصنف لابن أبي شيبة، رقم: 34406

“আল্লাহর নাফরমানিতে কোনো মাখলুকের আনুগত্যের সুযোগ নেই।” - মুসান্নাফে ইবনে আবি শাইবা: হাদীস নং ৩৪৪০৬

দু’জন দু’রকম উত্তর দিলে করণীয়

সংশয়যুক্ত বিষয়ে দ্বিতীয় কোনো নির্ভরযোগ্য আলেমকে জিজ্ঞেস করার পর তিনি যদি ভিন্ন ফাতওয়া প্রদান করেন, তখন মুস্তাফতির করণীয় কী হবে? এবিষয়ে ফুকাহায়ে কেরামের বিভিন্ন বক্তব্য রয়েছে। আমরা মনে করি, এখানে সে আলেমদের সঙ্গে আলোচনা পর্যালোচনা করে যদি কোনটি সঠিক তা নিশ্চিত হতে না পারে, তবে সে তার দিলের সাক্ষ্য অনুযায়ী আমল করবে। যেটিকে সে তার দ্বীনের জন্য অধিক নিরাপদ ও যথার্থ মনে করবে, সেটিকে গ্রহণ করবে। নফসের চাহিদা অনুযায়ী গ্রহণ করবে না। রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত ওয়াবিসা রা.কে লক্ষ্য করে বলেছিলেন,

اسْتَفْتِ قَلْبَكَ وَاسْتَفْتِ نَفْسَكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ الْبِرُّ مَا اطمَأْنَنْتَ إِلَيْهِ النَّفْسُ وَالْإِيمَانُ مَا حَاكَ فِي النَّفْسِ وَتَرَدَّدَ فِي الصَّدْرِ وَإِنْ أَفْتَاكَ النَّاسُ وَأَفْتَوُكَ. -مسند الإمام أحمد:

18006

“তোমার অন্তরকে জিজ্ঞেস কর। কথাটি তিনবার বললেন। নেক ও কল্যাণ হল যাতে তোমার অন্তর স্বস্তি পায়। আর গুনাহ হল, যা তোমার অন্তরে খটকা লাগে এবং সংশয় সৃষ্টি করে, যদিও সকল মানুষ তোমাকে ফাতওয়া দেয়।” -মুসনাদে আহমাদ: ১৮০০৬

ইমাম বুখারী রহ. হযরত আব্দুল্লাহ বিন উমর রা. থেকে বর্ণনা করেন,

لَا يَبْلُغُ الْعَبْدُ حَقِيقَةَ التَّقْوَى حَتَّى يَدَّعِ مَا حَاكَ فِي الصَّدْرِ. -صحيح البخاري،

باب الإيمان

“বান্দা তাকওয়ার হাকীকত পর্যন্ত পৌঁছাতে পারে না, যতক্ষণ না সে অন্তরে সংশয় সৃষ্টিকারী বিষয়গুলো পরিহার করে।” —সহীহ বুখারী, বাবুল ঈমান

অস্বাভাবিক অবস্থায় প্রশ্ন না করা

মুফতি সাহেব যখন কোনো অস্বাভাবিক অবস্থায় থাকেন, যেমন ঘুমের চাপ, ক্রোধাঘ্রিত, বেশি অসুস্থ ইত্যাদি অবস্থায় ইস্তেফতা করা ঠিক নয়। কারণ এসব মুহূর্তে উত্তর ভুল হওয়ার আশঙ্কা থাকে।

ইবনুস সালাহ রহ. (৬৪৩ হি.) বলেন,

ولا يسأله وهو قائم، أو مستوفز، أو على حالة ضجر، أو هم به، أو غير ذلك مما يشغل القلب. -ادب المفتي والمستفتي، ص: 169

“এমনিভাবে মুফতিকে দাঁড়ানো অবস্থায়, তাড়াহুড়ার মধ্যে, রাগের সময় কিংবা দুশ্চিন্তা ইত্যাদির সময় প্রশ্ন করবে না, যে বিষয়গুলো অন্তরকে অন্যমুখী করে রাখে।” —আদাবুল মুফতি ওয়াল মুস্তাফতি: ১৬৯

উত্তরের জন্য তাড়াহুড়ো না করা

ইস্তেফতা করে তাড়াহুড়া করা আদব পরিপন্থী। অনেক মুস্তাফতির মাঝেই এই প্রবণতা দেখা যায়। বিশেষ করে যখন কোনো সামাজিক দেন দরবার বা সালিশির সঙ্গে সম্পৃক্ত কোনো বিষয় হয়, তখন অধিকাংশকেই দেখা যায়, সালিশের তারিখ ঠিক করে দু’একদিন আগে মুফতি সাহেবের কাছে এসে বলেন, বৈঠক হবে তো, তাই মাসআলাটা একটু বৈঠকের আগেই দরকার! বারবার পীড়াপীড়ি করতে থাকেন এবং বিভিন্নভাবে প্রভাবিত করারও চেষ্টা করেন। বৈঠকের জন্য দ্বারে দ্বারে ঘুরে তাদের সময় অনুযায়ী সময় ঠিক হয়। আর মুফতি সাহেবের কাছে এসে নিজের সময় অনুযায়ী ফতোয়াটা পাওয়ার

জন্য চাপ সৃষ্টি করা হয়। এটা মস্ত বড় অন্যায়। অনেকের আচরণ উচ্চারণে মনে হয় যেন, তাড়া করে ফাতওয়া না দেয়ার উপর তারা খুবই বিরক্ত। অনেকে তো বলেই ফেলেন, এটা এমন কঠিন কি বিষয় হল যে, এক সপ্তাহেও হল না?

কাজি ইয়াজ রহ. (৫৪৪ হি.) বলেন

وقال مصعب: سئل مالك عن مسألة فقال لا أدري.

فقال له السائل إنما مسألة خفيفة سهلة، وإنما أردت أن اعلم بها الأمير.

وكان السائل ذا قدر فغضب مالك وقال مسألة خفيفة سهلة ليس في العلم شيء خفيف أما سمعت قول الله تعالى: (إنا سنلقي عليك عليل قولاً ثقیلاً) فالعلم كله ثقیل وبخاصة ما يسأل عنه يوم القيامة. -ترتيب المدارك وتقريب المسالك، ج: 1، ص: 96

“(ইমাম মালেক রহ.-র ছাত্র) মুসআব রহ. (২৩৬ হি.) বলেন, ইমাম মালেক রহ.কে একটি মাসআলা জিজ্ঞেস করা হয়েছে। তিনি বললেন, আমি জানি না। প্রশ্নকারী বলল, এতো একটা সহজ মাসআলা! আমার তো মাসআলাটা বাদশাহকে বলতে হবে! প্রশ্নকর্তা ছিলেন বড় কোনো ব্যক্তি। ইমাম মালেক রহ. তার কথায় রাগান্বিত হয়ে বললেন, সহজ মাসআলা?! ইলমের মধ্যে সহজ বলতে কিছু নেই! দেখ না আল্লাহ কোরআনে কী বলেছেন?

إنا سنلقي عليك قولاً ثقیلاً

“নিশ্চয়ই আমি আপনার উপর ভারী কথা অবতীর্ণ করি। (সূরা মুযাশ্শিল

(৭৩) : ৫)

সুতরাং ইলম সবই ভারী ও কঠিন। বিশেষ করে যে বিষয়ে কেয়ামতের দিন জিজ্ঞাসিত হতে হবে।” -তারতীবুল মাদারিক ওয়া তাকরীবুল মাসালিক: ১/৯৬

তিনি আরো বলেন,

قال ابن مهدي: سأل رجل مالكا عن مسألة وذكر أنه أرسل فيها من مسير ستة أشهر من المغرب.

فقال له أخبر الذي أرسلك أنه لا علم لي بها.

قال ومن يعلمها؟ قال من علمه الله.

وسأله رجل عن مسألة استودعه إياها أهل المغرب فقال ما أدري ما ابتلينا بهذه المسألة في بلدنا ولا سمعنا أحداً من أشيائنا تكلم بها ولكن تعود.

فلما كان من الغد جاءه وقد حمل ثقله على بغلة يقودها فقال مسألتي فقال ما أدري ما هي.

فقال الرجل يا أبا عبد الله تركت خلفي من يقول ليس على وجه الأرض أعلم منك.

فقال مالك غير مستوحش: إذا رجعت فأخبرهم أني لا أحسن. -ترتيب المدارك وتقريب المسالك، ج: 1، ص: 94

“ইবনে মাহদি বলেছেন, ইমাম মালেক রহ.কে এক ব্যক্তি প্রশ্ন করেছেন, যাকে ছয় মাস দূরত্বের পথ মরক্কো থেকে পাঠানো হয়েছে। মালেক রহ. তাকে বলে দিলেন, যিনি তোমাকে পাঠিয়েছেন, তাকে গিয়ে বলে দাও, এবিষয়ে আমার কিছু জানা নেই। তিনি বললেন, তাহলে কে জানে? ইমাম মালেক রহ. উত্তরে বললেন, যাকে আল্লাহ শিখিয়েছেন, তিনিই জানেন।

আরেক ব্যক্তি একটি মাসআলা জানতে চাইলেন। তাকেও মরক্কোবাসী পাঠিয়েছে। উত্তর দিলেন, জানি না। আমাদের এলাকায় এমন ঘটতে দেখিনি। কোনো শায়খ থেকেও এ বিষয়ে কিছু শুনিনি, তবে তুমি আরেকবার এসো!

পরদিন লোকটি তার সফরের গাড়ি বোহকাসহ গাধা হাঁকিয়ে এসে উপস্থিত। শায়খ, আমার মাসআলা? ইমাম মালেক রহ. বললেন, জানি না! লোকটি বলল, মুহতারাম আবু আব্দুল্লাহ! (এটি ইমাম মালেক রহ.র

উপনাম)। আমি অনেকের কাছে শুনে এসেছি, ভূপৃষ্ঠে আপনার চেয়ে বিজ্ঞ কেউ নেই! মালেক রহ. নির্দিষ্ট বললেন, তুমি তাদের গিয়ে বলে দাও, আমি খুব ভাল জানি না।” -তারতীবুল মাদারিক ওয়া তাকরীবুল মাসালিক: ১/৯৪

শরীয়তের মাসআলা আসলে কোনোটিই ছোট নয়। একটি মাসআলা বলার অর্থ, তা আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দিকে সমন্বয়িত করা। এজন্য মুফতিকে বলা হয় موقع عن الله तथा ‘আল্লাহর পক্ষ থেকে স্বাক্ষরকারী’। সুতরাং আল্লাহর পক্ষ থেকে একটি কথা বলার পর সেটা ভুল হয়ে যাওয়া ছোটখাট বিষয় নয়; অনেক গুরুতর ও ভয়ঙ্কর বিষয়। এজন্য বিজ্ঞ উলামায়ে কেরাম সকলেই ফাতওয়া প্রদানে সর্বোচ্চ সতর্কতা অবলম্বন করার চেষ্টা করতেন।

খতীব বাগদাদি রহ. বর্ণনা করেন, আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. বলেছেন,

من أفتى الناس في كل ما يستفتونه فهو مجنون. -الفقيه والمتفقه: 652

“যে ব্যক্তি সব ইস্তেফতার উত্তর দেয়, সে পাগল।” -আলফকিহ ওয়াল মুতাফাক্কিহ : বর্ণনা নং ৬৫২

ইমাম সুহনুন মালেকি রহ. বলেন,

أشقى الناس من باع آخرته بدنياه، وأشقى منه من باع آخرته بدنيا غيره.

“সবচেয়ে নিকৃষ্ট মানুষ হল, যে ব্যক্তি তার দুনিয়ার বিনিময়ে আখেরাত বিক্রি করে। তার চেয়েও নিকৃষ্ট, যে ব্যক্তি অন্যের দুনিয়ার বিনিময়ে নিজের আখেরাত বিক্রি করে।”

উক্ত বর্ণনাটি উদ্ধৃত করে ইবনুস সালাহ রহ. (৬৪৩ হি.) বলেন,

ففكرت فيمن باع آخرته بدنيا غيره، فوجدته المفتي يأتيه الرجل قد حنث في

أمرائه ورقيقه، فيقول له:

لا شيء عليك، فيذهب الحانث فيتمتع بامرأته ورقيقه. وقد باع المفتي دينه بدنيا

هذا"1. -ادب المفتي والمستفتي: 81

আমি যখন চিন্তা করলাম, অন্যের দুনিয়ার বিনিময়ে নিজের আখেরাত বিক্রয়কারী কে? দেখলাম তিনি হলেন, মুফতি। একজন মানুষ যখন তার স্ত্রী বা গোলাম বাঁদি সম্পর্কে কৃত কসম ভঙ্গ করে মুফতির কাছে আসে, তখন মুফতি বলে দেন, কোনো সমস্যা নেই। ফলে সে তালাকপ্রাপ্ত স্ত্রী ও আজাদকৃত গোলাম বাঁদি দ্বারা উপকৃত হয়। এই মুফতি সেই ব্যক্তির দুনিয়ার বিনিময়ে নিজের দীন বিক্রি করে দিল।” -আদাবুল মুফতি ওয়াল মুস্তাফতি : ৮১

এসব কারণে দেখা গেছে অতীতের উলামায়ে কেবাম যত বিজ্ঞ ও আল্লাহভীরু হতেন, ফাতওয়া প্রদানকে তারা তত বেশি ভয় করতেন এবং তা থেকে বিরত থাকার চেষ্টা করতেন এবং যত জটিল পরিস্থিতিই সৃষ্টি হত, তাহকিক পূর্ণ না করে কিছু বলতেন না।

বারা রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

لقد رأيت ثلاثمائة من أهل بدر ما منهم من أحد إلا وهو يحب أن يكفيه صاحبه

الفتوى. -الفقيه والمتفقه: 1071

“আমি তিনশত বদরী সাহাবিকে দেখেছি, তাঁদের প্রত্যেকের অবস্থা এমন ছিল যে, প্রত্যেকেই দিল থেকে চাইতেন, ফাতওয়াটি যদি অন্য কেউ দিয়ে দিত!” -আলফকিহু ওয়াল মুতাফাক্কিহ : বর্ণনা নং ১০৭১

ইমাম আবু হানিফা রহ. (১৫০ হি.) বলেন,

لولا الفرق من الله أن يضيع العلم ما أفتيت أحدا، يكون له المهنة وعلي الوزر

(1). -الفقيه والمتفقه: 1088

“যদি আল্লাহর পক্ষ থেকে এই ভয় না থাকত যে, ইলম নষ্ট হয়ে যাবে; তাহলে আমি কাউকে ফাতওয়া দিতাম না। এর দ্বারা তার উপকার হয় আর

আমার উপর গোনাহ আপতিত হয়” -আলফকিহ্ ওয়াল মুতাফাক্কিহ্ : বর্ণনা নং ১০৮৮

সুফিয়ান ইবনে উইয়াইনাহ রহ. (১৯৮ হি.) বলেন,

أعلم الناس بالفتوى أسكتهم فيه، وأجهل الناس بالفتوى أنطقهم فيه. -الفقيه

والمتفقه: 1074

“ফাতওয়া সম্পর্কে যিনি যত বিজ্ঞ, তিনি তত কম ফাতওয়া দেন।
যিনি যত অজ্ঞ, তিনি তত বেশি ফাতওয়া দেন।” -আলফকিহ্ ওয়াল
মুতাফাক্কিহ্: বর্ণনা নং ১০৭৪

সাহাবায়ে কেলাম রা. থেকে শুরু করে সর্ব যুগের বিজ্ঞ ফুকাহায়ে কেরামের
এমন হাজারো উক্তি ও কর্মে ইতিহাসের পাতা ভরপুর। এখানে আমরা নমুনা
হিসেবে কয়েকটি উদ্ধৃতি দিলাম।

সুতরাং একজন মুফতির কাছে ইস্তেফতা করলে, মুস্তাফতিকে অবশ্যই
কয়েকটি বিষয় মাথায় রেখে সবরের সঙ্গে অপেক্ষা করতে হবে।

এক. দীন ও ইলমে দ্বীনের ক্ষুদ্র থেকে ক্ষুদ্র প্রতিটি অংশই অনেক বড় ভারী ও
গুরুতর। এখানে হালকা ও সহজ বলতে কিছু নেই।

দুই. মুফতি যত বড় বিজ্ঞই হন, সব কিছু তার জানা থাকা জরুরি নয়; বরং
সম্ভবও নয়। সুতরাং কোনো প্রশ্নের উত্তরে যদি বলেন জানি না, তাতে ক্ষুব্ধ
হওয়ার কিছু নেই।

তিন. বরং মনে করতে হবে, এটিই আমার জন্য ইতিবাচক যে, মুফতি সাহেব না
জেনে উত্তর দেননি। নিজের অজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন। এটি তার মাঝে বিনয় ও
আল্লাহভীরুতার লক্ষণ। এমন ব্যক্তির কাছেই আমার দীন ও আখেরাত
নিরাপদ।

চার. সুতরাং একটি প্রশ্নের সঠিক উত্তরের জন্য যতটুকু প্রয়োজন সময় দিতে
হবে এবং সঠিক উত্তর পাওয়ার জন্য সবরের সঙ্গে অপেক্ষা করতে হবে।

والله تعالى أعلم، وعلمه أتم وأحكم، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه
أنيب، ما أصبت فمن الله، وما أخطأت فمني ومن الشيطان، اللهم اغفر لي ولوالدي
وللمؤمنين، وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً.

وكتبه العبد أبو محمد عبد الله المهدي

18 شعبان 1441 هـ.

13 أبريل 2020 ع.